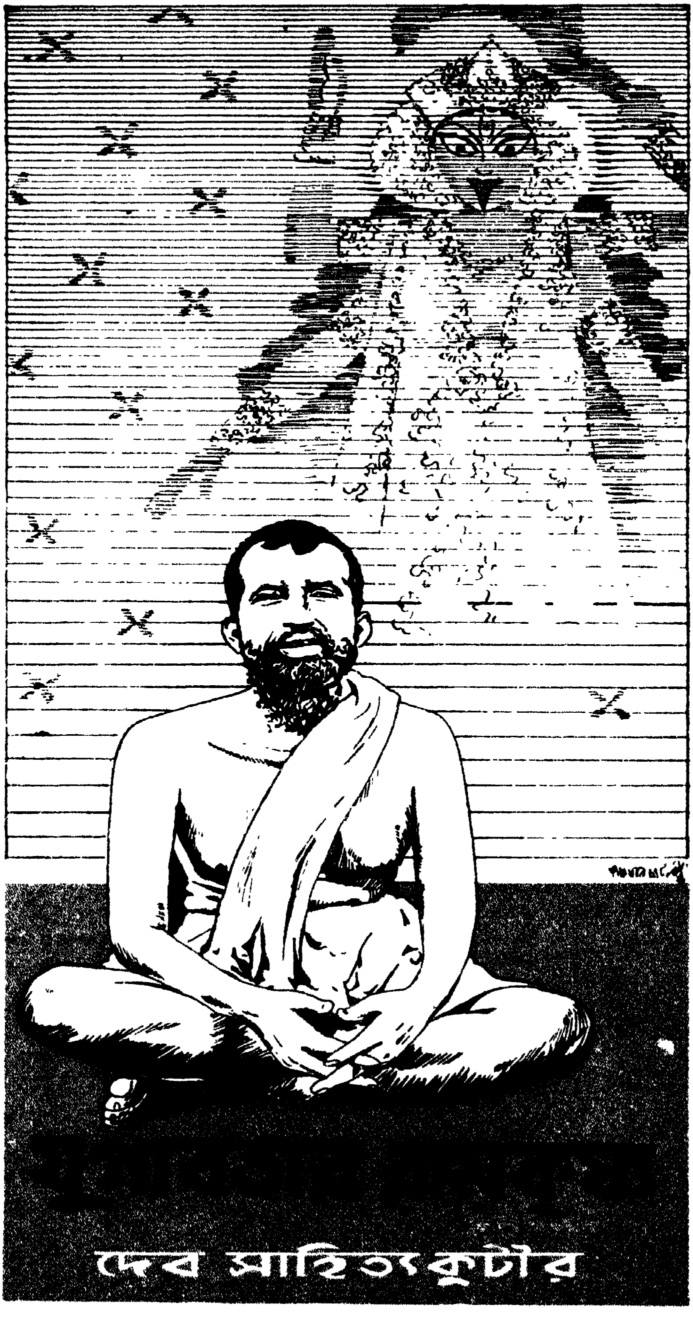

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জুলাই
১৯৫৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উপহার

[illegible] শুভ [illegible]
[illegible] প্রতি উপহার।

স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়
[illegible]
[illegible] ৫.৩.৭৯



এক

ক্ষেতের আলপথ দিয়ে মুড়ি চিবুতে চিবুতে চলেছে গদাধর।

মাঠে কাজ করছে চাষীরা। রাখালরা এসেছে গরু নিয়ে।

"কোথায় যাচ্ছ গো?" শুধায় রাখালরা।

কিন্তু সেদিকে কি খেয়াল আছে গদাধরের? সে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

একটুকরো কালো মেঘ ভেসে এল আকাশে। দেখতে দেখতে সেই মেঘে ছেয়ে গেল আকাশের অনেকটা জায়গা। তারপর কোত্থেকে এল এক ঝাঁক দুধের মত ধবধবে সাদা বক। তারা উড়ে গেল আকাশের বুক ছুঁয়ে।

আঃ কি সুন্দর! দেখে দেখে গদাধরের মনে কি ভাব হল কে জানে? অবশ হয়ে পড়ে গেল আলপথের ধারে।

"একি হল গো?" ছুটে এল রাখালরা।

এ যে ক্ষুদিরাম চাটুজ্যের ছেলে! মাথা ঘুরে পড়ে গেছে বুঝি! সবাই ধরাধরি করে তুলে এনে তাকে বাড়ি পেঁৗছে দিল।

ছ'বছর বয়স তখন গদাধরের। এই তার জীবনে প্রথম ভাবাবেশ।

কেউ কেউ বলে, ভাবাবেশ না ছাই! হিস্টিরিয়া।

মা চন্দ্রমণি কোন কথা বলেন না। তিনি মনে মনে স্মরণ করেন গৃহদেবতা রঘুবীরকে।

কামারপুকুরের মেয়েরা কিন্তু গদাধরকে ভালবাসে।

ফুটফুটে চেহারা। আর কি সুন্দর গান গায় ছেলেটা।

ফরমাশ করলেই গান গায় একটার পর একটা।

একদিন।

আনুড়ে বিশালাক্ষীর পূজো দিতে চলেছে কামারপুকুরের মেয়েরা।

কামারপুকুর থেকে ছু' মাইল দূরে আনুড় গ্রাম। সেখানেই গাছের তলায় বিশালাক্ষী দেবীর থান। খোলা মাঠের মধ্যে গাছ-তলায় পাথরের বিগ্রহ। জাগ্রত দেবী বিশালাক্ষী। তাই সারা বছর ভিড় লেগেই থাকে।

কামারপুকুরের মেয়েরা দল বেঁধে চলেছে পায়ে হেঁটে। সেই দলে আছে সীতানাথ পাইনের মেয়ে রুক্মিণী, ধর্মদাস লাহার বিধবা মেয়ে প্রসন্ন এবং আরও অনেক মেয়ে।

হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হল গদাধর। বলল, "আমিও যাব।"

"তুই যাবি কিরে? এতটা পথ হাঁটবি কেমন করে?"

"খুব হাঁটতে পারব।"

তখন আর আপত্তি করে না কেউ। যাক না, তবু তো একজন সঙ্গী বাড়ল। গান গাইবে। পথে সময়টা কাটবে ভাল।

"গান গাইতে হবে কিন্তু গদাই।"

গানের বেলায় গদাইয়ের আলস্য নেই। সে খোলা গলায় গান গাইতে গাইতে চলল। দেবী বিশালাক্ষীর মহিমা-কীর্তনের গান।

পথ আর বেশী বাকী নেই। তাকালেই দূরে দেখা যায় বিশালাক্ষীর গাছ।

হঠাৎ গদাধরের গান থেমে গেল। ঠায় দাড়িয়ে পড়ল সে। ছু'চোখ বেয়ে পড়তে লাগল জলের ধারা।

মেয়েরা চমকে উঠল সবাই। এ কি হল!

"গদাই! ওরে গদাই!"

সাড়া দেয় না। নড়েও না গদাধর।

প্রসন্ন ছুটে এসে ধরতেই অবশ গদাই ঢলে পড়ল তার কোলে।

"আঃ, এতটা পথ হেঁটে এসে বাছা অস্থির হয়ে পড়েছে। আগেই বলেছিলাম এসে দরকার নেই।"

প্রসন্ন আঁচলে হাওয়া করতে লাগল। কাছেই ছিল পুকুর। মেয়েরা কেউ কেউ ছুটে আঁচল ভিজিয়ে জল এনে গদাধরের মুখে চোখে ছিটাতে লাগল।

জ্ঞান নাই গদাধরের। মেয়েরা তার চারদিক ঘিরে বসল।

"গদাই! ও গদাই!"

সাড়া নেই। পরের ছেলে। কি উপায় হবে?

প্রসন্ন বললে, "আমার মনে হয়, মা বিশালাক্ষীই ভর করেছেন ওর ওপর। এসো, আমরা গদাইকে না ডেকে মা বিশালাক্ষীকেই ডাকি।"

মেয়েরা সবাই মানে প্রসন্নকে। ছোটবেলা থেকেই দেবদ্বিজে ওর ভক্তি।

"মাগো, মা বিশালাক্ষী, দয়া কর। প্রসন্না হও মা। এ বিপদে রক্ষা কর।"

গদাইয়ের জ্ঞান হল। তাকাল চোখ মেলে। মুখে ফিকফিক হাসি। "মাকে ডাকছো তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো গো? আমি তো গদাই।"

প্রসন্নর মুখে হাসি। "নৈবেদ্যের এত ডালি কি হবে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে। গদাইকে কিছু খেতে দে। তবেই মাকে খাওয়ানো হবে।"

গদাইকে সবাই খাওয়ায় দুধ, কলা, আরো কত কিছু ফল। তারপর সবাই মিলে আনন্দে দেবীর থানে পৌঁছে পূজো দেয়। বাড়িতে ফিরে মেয়েরা চন্দ্রমণিকে বলল সব কথা। চন্দ্রমণি ছেলের বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, "এই রোদের মাঝে কেন গেছিলি বাছা?"

বিশালাক্ষীর উদ্দেশ্যে চন্দ্রমণি বারবার প্রণাম করেন। রঘুবীরের দোরে মাথা ঠোকেন।

দুই

গৃহদেবতা 'রঘুবীর'।

করুণা করে নিজেই এসেছেন এই চাটুজ্যে পরিবারে।

আশ্চর্য, অভিনব সেই কাহিনী।

তখন এই চাটুজ্যে পরিবার বাস করতেন 'দেরে' গ্রামে।

সেখানেই তাঁদের পৈতৃক নিবাস। কামারপুকুরে আসেননি তখনও।

ক্ষুদিরাম চাটুজ্যে একদিন ভিন গাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় এক গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসলেন। হঠাৎ চোখে যেন তন্দ্রার ঘোর লাগল। গা এলিয়ে দিলেন গাছেব তলায়।

স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন। নবদূর্বাদল শ্যামরূপ। আহা মরি মরি, কি মনোহর!, কিন্তু মুখটি যেন মলিন।

বালকবেশী রামচন্দ্র বললেন, "আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। এখানে বড় কষ্টে আছি।"

ক্ষুদিরাম চমকে উঠলেন। বললেন, "আমি অতি দীন দরিদ্র। কি দিয়ে সেবা করব তোমার?"

"ভক্তিভরে যেভাবে সেবা করবে, তাতেই আমি খুশী থাকব।"

ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। এদিকওদিক তাকিয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। কোথায় গেলেন বালকবেশী দেবতা? অথচ বলে গেলেন—এখানেই আছেন তিনি।

পাশেই ধানক্ষেত। সেদিকেই এগিয়ে চললেন ক্ষুদিরাম

কিছুদূর গিয়েই দেখলেন, একটুকরো পাথরের ওপর একটি বিষধর সাপ ফণা মেলে আছে। বিরাট বিষধর সাপ। দেখে ক্ষুদিরাম ভয়ে পিছিয়ে এলেন। কিন্তু মুহূর্তেই সাপ কোথায় চলে গেল কে জানে!

ভয়ে ভয়ে পাথরটি তুলে নিলেন ক্ষুদিরাম। লক্ষণ দেখে বুঝলেন এ 'রঘুবীর শিলা'।

মনে সন্দেহ রইল না ক্ষুদিরামের। স্বয়ং রামচন্দ্রই শিলারূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

সেইদিন থেকে গৃহে রঘুবীরের প্রতিষ্ঠা হল।

ক্ষুদিরামের তখন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। রামকুমার আর কাত্যায়নী। গদাইয়ের জন্ম হয়নি তখনো।

এত ভক্তি, নিষ্ঠা, তার ওপর গৃহদেবতার কৃপা! তবু সংসারে টানাটানি লেগেই আছে।

তখন বাংলা ১২২০ সাল। ক্ষুদিরাম পৈতৃক নিবাস দেরে গ্রাম ছেড়ে কামারপুকুরে এলেন। সঙ্গে এলেন পত্নী চন্দ্রমণি, প্রথম পুত্র রামকুমার ও কন্যা কাত্যায়নী। গৃহদেবতা রঘুবীরকেও নিয়ে এলেন সঙ্গে।

তারও বারো বছর পরে কামারপুকুরে ক্ষুদিরামের আর একটি ছেলে হল। দ্বিতীয় ছেলে। নাম রাখা হল রামেশ্বর।

মেয়ে কাত্যায়নীর বিয়ে দেওয়া হল। স্বামীর ঘর করতে চলে গেল আনুড়ে।

কাটতে লাগল দিনের পর দিন।

ভাবপ্রবণ মন পরম বৈষ্ণব ক্ষুদিরামের।

ভাবলেন, বাবা মা তো অনেকদিন গত হয়েছেন। এবার পিণ্ড দিয়ে আসি। তাই চললেন গয়াধামে।

সেটা ১২৪১ সালের শীতকাল।

গয়ায় পৌঁছে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিলেন ক্ষুদিরাম। সেদিন রাত্রেই দেখলেন এক বিচিত্র স্বপ্ন।

শ্রীশ্রীগদাধর এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। বলছেন মৃদু মধুর হেসে, "তোমার পুত্র হয়ে জন্ম নেব আমি। সেবা নেব তোমার হাতে।"

ক্ষুদিরাম ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত। বললেন, "আমি অতি অভাজন, দীন দরিদ্র। তোমার সেবা করার কি সাধ্য আছে আমার?"

অভয় দিয়ে বললেন গদাধর, "যা জুটবে তাই খাওয়াবে আমাকে। আমি ভোগের কাঙাল নই, আমি চাই ভক্তি।"

ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। কী দেখলেন তিনি! এ কি স্বপ্ন না সত্য!

ওদিকে কামারপুকুরে চন্দ্রমণিও রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন। কে এক দিব্যপুরুষ এসে ঢুকছেন তাঁর ঘরে। ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রমণি। বাতি জ্বাললেন।

কই, কেউ কোথাও নেই তো?

ঘরের দোর তেমনি আঁটা রয়েছে। রয়েছে খিল দেওয়া।

তবে?

শিবমন্দিরে পূজো দিতে গেলেন চন্দ্রমণি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শিবকে প্রণাম করলেন।

হঠাৎ মনে হল মহাদেবের গা থেকে একটা আলো বেরিয়ে এসে তাঁর গায়ে লাগল। তারপর সেই আলোটা যেন ঢুকতে লাগল তাঁর শরীরের ভেতর।

কী তেজ! অস্থির হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন চন্দ্রমণি। ধনী কামারনী ছিল পাশে দাঁড়িয়ে। সে-ই তাঁকে ধরল।

সুস্থির হয়ে চন্দ্রমণি সব কথা খুলে বললেন ধনী কামারনীকে। ধনী বলল, "ও কিছু নয়, তোর বায়ুরোগ হয়েছে।"

এর কিছুদিন পর ক্ষুদিরাম ফিরলেন গয়াধাম থেকে।

রাত্রে চুপি চুপি চন্দ্রমণি বললেন স্বামীকে সব কথা।

"আমার পেটে যেন কেউ এসেছে গো! ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।"

"চুপ, কাউকে বলো না। গদাধর আসছেন—"

পাড়াপড়শী মেয়েরা বলাবলি করে—"বুড়ো বয়সে চন্দ্রমণির গর্ভ হয়ে রূপ যেন ফেটে পড়ছে।"

কেউ কেউ হিংসা করে বলে—"গর্ভ হয়েছে না ছাই হয়েছে। পেটে ওর ব্রহ্মদত্যি ঢুকেছে। এবার বাঁচলে হয়!"

চন্দ্রমণির মনে হয় তাঁর এ গর্ভ পতিস্পর্শে ঘটেনি।

ক্ষুদিরামের নিশ্চিত ধারণা, তাঁর ঘরে পুত্ররূপে আসছেন নারায়ণ।

১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন—ইংরেজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। বুধবার।

প্রসব ব্যথা উঠল চন্দ্রমণির। ধনী কামারনীকে খবর দেওয়া হল। সে এসে রইল চন্দ্রমণির কাছে।

ঢেঁকি ঘরে নিয়ে আসা হল চন্দ্রমণিকে। সেখানেই হবে আঁতুড়-ঘর। ঘরের একদিকে ধান ভানবার একটা ঢেঁকি আর ধান সেদ্ধ করবার একটা উনুন।

সেই ঘরেই এল নবজাতক।

নরদেহে দেবশিশু।

চন্দ্রমণি ব্যাকুল হলেন সন্তানকে দেখবার জন্য।

ধনী কামারনী বলল, "আহা অত ব্যস্ত কেন? তুই নিজে আগে সুস্থির হ'। ছেলেকে তো দেখবিই।"

কিছুক্ষণ পর চন্দ্রমণি সুস্থির হলেন।

"আমার ছেলে আমার কোলে দে..।"

কিন্তু কোথায় ছেলে ?

ধনী কামারনীর মুখ কালো হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে কোথাও ছেলে নেই। কোথায় গেল তাহলে ?

ওমা, ও কি ! পেছল মাটিতে হড়কে হড়কে ধান সেদ্ধ করার উনুনের ভেতর গিয়ে পড়েছে ছেলে। রক্ষা উনুনে আগুন নেই। কিন্তু ছাই তো রয়েছে।

ধনী কামারনী ছেলেকে টেনে তুলল আলগোছে। সারা গায়ে ছাই মাখা। যেন ভস্মমাখা ক্ষুদে মহাদেব।

ছাই মুছে ধনী কামারনী শিশুকে তুলে দিল তার মায়ের কোলে। "নাও, এই তোমার ছেলে।"

তিন

"কি নাম রাখবে ছেলের ?"

চন্দ্রমণি শুধান ক্ষুদিরামকে। ক্ষুদিরাম বলেন, "কি আর নাম রাখবো ? গয়ায় গিয়ে গদাধরের দেখা পেলাম। ছেলের নামও রাখবো গদাধর।"

সেই নামই রাখা হল। ডাকনাম হল গদাই।

একদিন ছেলেকে কোলে নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ মনে হল কোল জুড়ে যেন পাথর পড়ে আছে। নামিয়ে রাখলেন কোল থেকে একটি কুলোর ওপর। কিন্তু শিশুর ভারে কুলো চড় চড় করে উঠল। কুলোও বুঝি ভেঙে যাবে !

চন্দ্রমণি আবার ছেলেকে কোলে নিতে চাইলেন। কিন্তু আর কি উঠাতে পারেন। ছেলে যেন ভারী পাষাণ ! নড়েও না।

"একি হলো গো !" কাঁদতে লাগল চন্দ্রমণি।

সবাই ছুটে এল।

"কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?"

"ছেলেকে কোলে তুলতে পারছি না।"

"ছেলের ওপর নিমগাছের ব্রহ্মদত্যিটা ভর করেনি তো ?"

"ষাট্, ষাট্—বালাই ! তা হবে কেন ?" ধনী কামারনী ঝাড়ফুঁক দিতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। হালকা হয়ে গেল শিশুর দেহ। মা আদর করে কোলে তুলে নিলেন ছেলেকে।

আর একদিন।

মশারির তলায় ছেলেকে শুইয়ে রেখে চন্দ্রমণি গেছেন ঘরের কাজ সারতে। ফিরে এসে দেখেন ছেলে বিছানায় নেই। তার বদলে সেখানে শুয়ে আছে এক বিরাট পুরুষ।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রমণি, "ওগো, দেখে যাও বিছানায় কে শুয়ে আছে।"

ছুটে এলেন ক্ষুদিরাম।

"কই, গদাই তো আছে শুয়ে। ঐ তো হাত্ পা নেড়ে খেলা করছে।"

"কিন্তু, আমি যে দেখলাম—"

"থাক, কাউকে কিছু বলো না!"

ছেলে বড় হল। পাঁচ বছরে পড়ল গদাধর।

লাহাবাবুদের বাড়ির সামনে নাটমন্দিরে পাঠশালা। 'পাততাড়ি' বগলে করে গদাধর সেই পাঠশালায় এসে হাজির হল।

সকালে বিকেলে দু'বার করে বসে পাঠশালা। সকালে দু'তিন ঘণ্টা পড়ার পর চান খাওয়ার জন্য ছুটি। তারপর বিকেল থেকে পাঠশালা চলে একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

পড়াশোনায় খুব বেশী মন নেই গদাধরের। তবু পাঠশালায় আসতে তার ভাল লাগে। এতগুলি ছেলে এক সঙ্গে জড়ো হয়—এ কি কম আনন্দ!

বাংলাটা পড়তে ভালোই লাগে। কিন্তু অঙ্ক কষতে গেলেই হয় যত মুশকিল। এক দুই তিন—এমনি করে মাপকাঠির গণ্ডিতে কি মনটাকে বেঁধে রাখা যায়? মনটা যে তার বিরাট।

মাস্টারমশাই পড়া ধরলেই হয় আর এক বিপদ। সব কিছু গুলিয়ে যায় যেন। তার চেয়ে স্তোত্র প্রণাম মুখস্থ বলা অনেক ভালো।

"বর্ণপরিচয় শিখে নিয়ে তারপর পড়বো। অত ধৈর্য আমার হবে না। পড়তে পড়তেই বর্ণপরিচয় হয়ে যাবে। দাও না তালপাতার ওপর ঠাকুরের নাম লিখতে। খচ্‌খচ্‌ করে লিখে যাব সব।"

একদিন মধুযোগীর বাড়িতে গদাধর প্রহ্লাদ-চরিত পড়ছে। এতটুকু শিশুর মুখে এমন মধুর পাঠ কেউ কোনদিন শোনে নি। ভিড় জমে গেল খুব। কাছেই আমগাছের ওপর বসেছিল একটা হনুমান। সে লাফ দিয়ে এসে ঠিক গদাধরের কাছে এসে গদাধরের পা জড়িয়ে ধরল।

হইচই করে উঠল সবাই। কিন্তু গদাধর একটুও ভয় পেল না। হনুমানের মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে দিল।

শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ পেল বুঝি তাঁর ভক্ত হনুমান। তাই খুশী হয়ে চলে গেল আবার গাছের ওপর।

বাঁড়ুয্যে-বাগানের মাঠে গরু চরাচ্ছে রাখালরা। হঠাৎ গদাধর গিয়ে হাজির হল সেখানে। বলল, "আয় কৃষ্ণযাত্রা করি।"

সবাই রাজী।

"কি পালা হবে ?"

"মাথুর।"

"বেশ তাই হোক।"

গদাই গান গায় ভালো। তার মুখে কৃষ্ণের গান অনেক দিন শুনেছে তারা। আজ শুনবে রাধার গান। কৃষ্ণের বিরহে কাতর রাধিকার করুণ উচ্ছ্বাস।

গাছের তলায় যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

মাথুর পালার গান ধরল গদাধর।···কোথায় তুমি কৃষ্ণ ! পৃথিবীর সব কিছু আকর্ষণ কর তুমি···তাই তুমি কৃষ্ণ। তবে আমাকে কেন সরিয়ে রেখেছ দূরে ? এসো এসো তুমি।

গাইতে গাইতে ভাবে বিভোর হয়ে পড়ল গদাধর।

"গদাই, ওরে গদাই, কি হল তোর ?"

চোখ মুখ বুজে গেছে গদাধরের। গলার স্বর গেছে বন্ধ হয়ে। তাই দেখে ভয় পেয়ে যায় খেলার সাথীরা।

কেউ গায়ে ঠেলা দেয়, কেউ চোখে মুখে জল ছিটোয়।

একজন কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ—'

চোখ মেলে তাকায় গদাধর।

পুজোয় বসেছেন ক্ষুদিরাম। গৃহদেবতা রঘুবীরকে চন্দনে ও ফুলে সাজিয়ে চোখ বুজে বসেছেন আসনে। পাশে পড়ে আছে গোলা চন্দন ও ফুলের মালা।

গদাধর গিয়ে হাজির হল সেখানে। মালাটি দেখে লোভ হল তার, লোভ হল চন্দন দেখে। বাটি থেকে চন্দন তুলে নিয়ে মাখল কপালে, গালে, তারপর সারা গায়ে। মালাটি তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরল। তারপর বলল, "বাবা দেখ, কেমন সেজেছি, দেখ।"

রঘুবীরের ধ্যানে বিভোর ক্ষুদিরাম। চোখ মেলে তাকালেন। চমকে উঠলেন দেখে গদাধরকে। রঘুবীররূপী গদাধর !

চার

দুর্গাপূজো ঘনিয়ে আসছে। ক্ষুদিরাম গেলেন ছিলিমপুরে ভাগনে রামচাঁদের বাড়িতে। ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হয় সেখানে।

গদাধর আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মা চন্দ্রমণি আসতে দেন নি। ছেলেকে কাছ ছাড়া করে কেমন করে থাকবেন!

একা এলেন ক্ষুদিরাম। সঙ্গে গদাধর নেই। মনটা ফাঁকা ফাঁকা। কয়েকদিন পরেই পড়লেন অসুখে।

পুজো শুরু হয়ে গেল। নবমীর দিন খুব বাড়াবাড়ি! বাড়িতে পূজোর ধুমধাম, কে অত খেয়াল রাখে!

কিন্তু সব কিছু খেয়াল আছে ক্ষুদিরামের। কাউকে কষ্ট দিতে চান না। দশমীর সন্ধ্যা। ক্ষুদিরাম জিজ্ঞেস করলেন—"বিসর্জন হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। ভাসান হয়ে গেছে প্রতিমার।"

ভাসানের পর রামচাঁদ এলেন মামার কাছে। দেখলেন মামার জীবনের সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে। ক্রমশঃ আড়ষ্ট হয়ে আসছে জিভ।

"মামা, একবার রঘুবীরকে ডাকো।"

"রঘুবীর, রঘুবীর, রঘুবীর।" তিনবার নাম করলেন ক্ষুদিরাম। তারপরই চোখ বুজলেন।

বাবাকে হারাল গদাধর মাত্র সাত বছর বয়সে। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। মায়ের কান্না দেখে আরো বেশী করে কান্না পেল তার।

একা একা ঘুরে বেড়াল ভূতির খালের শ্মশানে। মরার পর এখানেই তো লোকদের পোড়ান হয়। কোথায় যায় তারা? বাবাই বা কোথায় গেলেন!

সাত পেরিয়ে আটে পড়লেন গদাধর। এবার পৈতে দিতে হবে। বড়দাদা রামকুমারই এখন সংসারের কর্তা। তিনি সব ব্যবস্থা করলেন।

আচার নিয়মের কোন ত্রুটি হল না। পৈতে হয়ে গেল। এখন ভিক্ষে নিতে হবে মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু গদাধর গোঁ ধরল, ভিক্ষা নেবে সে ধনী কামারনীর কাছ থেকে। ধনী কামারনী তার ধাইমা। সেও তো মা।

ছিঃ ছিঃ একি অলক্ষুণে কথা। ধনী কামারনী ছোট জাতের মেয়ে। তার হাতে ভিক্ষে নেবে গদাধর? তা হতে পারে না।

"কেন হতে পারে না? কুলাচার নষ্ট হবে? তোমরা তোমাদের কুলাচার নিয়ে থাকো। ধনী কামারনী আমাকে ছেলের মত ভালবাসে। তাকে মা বলব, তার কাছ থেকে ভিক্ষে চাইব, এতে দোষটা কোথায়?"

অভিমান করে দরজায় খিল এঁটে রইল গদাধর। কিছুতেই খোলে না।

"গদাই, দরজা খোল। দরজা খোল।"

এতক্ষণ উপোস করে আছে, তবু খিল খোলার নাম নেই গদাধরের।

শেষে এলেন দাদা রামকুমার। বললেন, "বেশ, ধনী কামারনীই ভিক্ষা দেবে তোকে। আয়।"

এবার হাসি হাসি মুখে বেরিয়ে এল গদাধর।

ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ধনী কামারনীর দোরে গিয়ে বলল, "ভিক্ষে দাও মা।"

ধনী কামারনী আঁজলা ভরে ভিক্ষা দিল। সারা পৃথিবী যাঁর কৃপা ভিক্ষার কাঙাল তাঁকে সে আজ দিল ভিক্ষা! কী সৌভাগ্য তার!

ঘরে মন বসে না গদাধরের।

সারাদিন ঘুরে বেড়ায় বাইরে বাইরে। গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কেমন যেন এক আনমনা ভাব।

খেলার সাথীদের নিয়ে যাত্রা করে—গান করে বেড়ায়।

কারুর বাড়ির সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় গদাধর। কে যেন ডাকছে।

"গদাধর, আয় দুটো গান শুনি।"

গদাধর গান ধরে। ভিড় জমে যায়।

কামারপুকুরে পাইনদের বাড়ি শিবরাত্রির সময় প্রতিবছর যাত্রা হয়। এবারও হবে। বিরাট শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। বাজনা বাজছে। লোকও জড়ো হয়েছে অনেক।

শিবের পালা নিয়ে যাত্রা হবে। কিন্তু যে ছেলেটা শিব সাজবে তার দেখা নেই। অসুখ না কি হয়েছে, তাই সে আসতে পারবে না।

সব লোক ঘিরে ধরল অধিকারীকে। "মশাই, গানের ব্যবস্থা করুন। নইলে রাত জাগব কেমন করে?"

আসর ফাঁকা যাবে? নিয়ম ভঙ্গ হবে এবার? পাইন বাড়ির লোকেরাও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অধিকারী বললেন, "আপনাদের গাঁয়ে কেউ আছে শিব সাজবার মত লোক? তাহলে কোনরকমে চালিয়ে দিতে পারি!"

শিব কে সাজবে? এমন লোক কে আছে?

কে একজন বলল, "গদাইকে সাজালে কেমন হয়?" সবাই তখন

অকূলে কূল পেল যেন। বলে উঠল, "ভাল হয়, খুব ভাল হয় শিবের গান ওর জানাও আছে অনেক।"

তখন গদাইকে নিয়ে টানাটানি। "গদাই, তোকে শিব সাজতেই হবে।"

"আমি কি পারব?"

"খুব পারবি। শিবের পোশাকে তোকে মানাবেও ভালো।"

গদাইকে রাজী হতেই হল।

শিব সেজে আসরে এসে দাঁড়াল গদাধর। আসর যেন আলো হয়ে গেল! আহা, মরি মরি কী রূপ! এক হাতে শিঙা, এক হাতে ত্রিশূল। গলায় জড়ানো সাপ। যেন সত্যি শিব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

গান আরম্ভ হল। অধিকারী শিবস্তুতি শুরু করলেন।

গদাধর যেন শিবময় হয়ে যাচ্ছে এবার! শিবই যেন ভর করেছেন তার কাঁধে! কি সুন্দর পাঠ করছে আর গান গাইছে গদাধর!!

হঠাৎ একি হল! শিব কি সত্যি ভর হল ওর ওপর? গানও করছে না, কথাও বলছে না।

কাঁদছে শিব! দু'গাল বেয়ে চোখের জল ঝরছে! পৃথিবীর কর্তা মহেশ্বর কি কাঁদে কখনো?

অনেকে এগিয়ে গেল গদাধরের কাছে।

"গদাধর! গদাধর!"

জ্ঞান নেই। ভাবাবেশ হয়েছে ওর।

"ওরে জল আন, বাতাস কর। শিবের ভর হয়েছে। কানে শিবমন্ত্র দে।"

অনেক কিছু করেও জ্ঞান হল না গদাধরের। যাত্রা ভেঙে গেল। কাঁধে করে কয়েকজন তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

সারারাতেও জ্ঞান হল না। রঘুবীরের কাছে চন্দ্রমণির কত

কান্নাকাটি। "ঠাকুর ওকে ভাল কর। না বুঝে শুনে ও শিব সাজতে গিয়েছিল। কি দোষ করেছে, তাই বুঝি কোপ হয়েছে শিবের। তুমি ওকে ক্ষমা কর ঠাকুর।"

চন্দ্রমণি বুঝেও যেন অবুঝ আজ। ছেলের অবস্থা দেখে দিশেহারা। যিনি এই ছেলের অন্তর জুড়ে রয়েছেন তিনি রাগ করবেন কার ওপর?

সারা রাত গেল। ভোরবেলা জ্ঞান হল গদাধরের। চন্দ্রমণি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

"তোমার ছেলেকে দানোয় পেয়েছে গো!"

নইলে যখন তখন ভাবাবেশ হয় কেন গদাধরের? একি ভাবাবেশ না হিস্টিরিয়া। সন্দেহ করে কেউ কেউ।

হরিবাসরে, শিবের গাজনে, মনসা-ভাসানে কোথাও একটু নামগান হলেই হল। শুনতে শুনতে গদাধরের ভাবাবেশ হয়, তারপরই অজ্ঞান। আবার নিজে নিজেই জ্ঞান হয়।

দাদারা ভাবেন বায়ুরোগ হয়েছে গদাধরের। তাই পড়াশোনার চাপ দেন না বেশী তার ওপর। বামুনের ছেলে, খুব বেশী লেখাপড়া শেখার দরকার কি? বড় হলে করবে তো যজমানি। রামায়ণ মহাভারত পড়া, মন্ত্র আওড়ানো আর একটু শাস্ত্রজ্ঞান হলেই যথেষ্ট।

বড়দা রামকুমার। নিজেই সংসার আগলে রাখেন। কিন্তু সামান্য আয়। সংসার চলাই মুশকিল।

রামকুমার বিয়ে করেছেন। সতী সাধ্বী স্ত্রী।

বউয়ের ছেলেপুলে হবে। তাই চন্দ্রমণি তাকে সাবধানে চলাফেরা করতে বলেন। কিন্তু সন্তান পেটে আসতেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছে বউটি। কারুর কোন কথা শুনতে চায় না।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে দাওয়ায় বসে আছে গদাধর। চন্দ্রমণি ঘরে রঘুবীরের সন্ধ্যাবাতির আয়োজন করছেন। এমন সময় বাইরের পুকুর থেকে চান করে ভেজা কাপড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল রামকুমারের স্ত্রী।

চন্দ্রমণি ঘর থেকেই দেখতে পেলেন। ডেকে বললেন, "তোমাকে কতবার বারণ করলাম বউমা, শুনলে না। গায়ে জ্বর নিয়েই অবেলায় নেয়ে এলে!"

"জ্বর তো রোজই হচ্ছে, তাই বলে নাইবো না?" বলে রামকুমারের স্ত্রী বাড়ির মধ্যে চলে গেল। চন্দ্রমণি আপন মনেই বলতে লাগলেন, "কি যে হয়েছে বউয়ের! কোন কথা মানতে চায় না।"

গদাধরের মনে ব্যথা লাগে। মাকে অমান্য করে! ছিঃ, এ কেমন ব্যাপার? সে দাওয়ায় বসেই জোর গলায় বলে ওঠে, "মায়ের কথা শোনে না, কেমন মেয়ে?"

চন্দ্রমণি হেসে ওঠেন সে কথা শুনে। বলেন, "আমি তো মা নই। মা হলে মানতো।"

গদাধর বলে, "তুমি তো মা-ই।"

চন্দ্রমণি বলেন, "না, শাশুড়ী।"

"শাশুড়ীই তো মা।"

"তবু পরের মেয়ে, না মানলে কি করা যাবে?"

"না মানলে শাস্তি পাবে।"

সে কথা শুনে শিউরে উঠলেন চন্দ্রমণি। বালাই ষাট! ছেলে বলছে কি! এ তো যে সে ছেলে নয়। যদি ওর কথা সত্যি ফলে যায়? বউমা যে পোয়াতি।

রামকুমারও জানেন ছেলে হবার সময়ে তাঁর পত্নীর জীবনে সাংঘাতিক এক ফাঁড়া! শাস্ত্রজ্ঞ, দৈবজ্ঞ রামকুমার। যে সন্তান আসছে

তাঁর সংসারে সে সুলক্ষণযুক্ত নয়। তাই অলক্ষ্মী চেপেছে তাঁর স্ত্রীর কাঁধে। অনিয়ম অনাচার করে বেড়াচ্ছে দিনরাত।

কাজেও তাই হল।

একদিন রাত্রি বেলা শিশুর কান্না শোনা গেল আঁতুড়ঘর থেকে। ছেলে হয়েছে রামকুমারের। কিন্তু সেই ছেলে দেখার সৌভাগ্য হল না মায়ের। আঁতুড়ঘরেই মারা গেল রামকুমারের স্ত্রী।

চন্দ্রমণি মা-মরা শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন।

রামকুমার রঘুবীরের সামনে গিয়ে মাথা কুটতে লাগলেন···একি করলে ঠাকুর!

গদাই! গদায়ের কি হল কে জানে! রাতের অন্ধকারেই ছুটে গেল সে ভূতির খালের ধারে নির্জন শ্মশানে। ছুটে ছুটে কাঁদল শুধু। ফিরে এসে বলল, "মা, আর কক্ষনো কিছু বলবো না আমি কাউকে। আর কক্ষনো না।"

শ্রাবণের বেলা শেষ। আকাশ মেঘে ঢাকা। পুকুরের ধারে বিষণ্ণ মনে বসে আছে রামকুমার।

গদাধর পাশে এসে বসল। "দাদা, এত কী ভাবছ বসে বসে!"

রামকুমার মুখ তুললেন। সে মুখ অশ্রু-ছলছল। নির্বাক্।

গদাধর বলল, "এতো ভাবছ কেন? বাবা ছিলেন, নেই। বউদি ছিলেন, নেই। থাকবার হলে তো থাকতোই।"

রামকুমার অবাক্ হলেন ছোট ভাইটির কথা শুনে। দুঃখেও হাসি এল। বললেন, "ওসব কথা ভাবছি কে বললে তোকে?"

"তবে কি ভাবছো?"

"ভাবছি কেমন করে দিন চলবে। ঘর-সংসার, ঠাকুর-পুজো, খাওয়া-পরা, তোদের মানুষ করা, এসব চলবে কিভাবে।"

"এতদিন তো চলতো।"

"তখন ভাবনা ছিল না। বাবা চালাতেন।"

"তুমি না থাকলে চলতো কি করে?"

"সে কথাই তো ভাবছি। তোর মেজদা রামেশ্বর তো কোন দিকেই খেয়াল করে না। তুইও কী যে হচ্ছিস। তোদের নিয়েই যত জ্বালা।"

"বাবা তো বলতেন, তিনি চালান না, রঘুবীর চালান। এখনও রঘুবীর চালাবেন।"

রামকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে গেলেন।

সংসার ক্রমে ক্রমে সত্যি অচল হয়ে উঠল। যজন যাজনের কাজ করে যা উপায় হয় তাতে সংসার চলে না।

সংসারে পোষ্য বেড়েছে। রামেশ্বর বিয়ে করেছে। আয় না বাড়লে এখন চলবে কেমন করে?

কলকাতায় চলে এলেন রামকুমার। মেজো ভাই রামেশ্বরকে বলে এলেন, "তুই দেখে শুনে সংসার কর্।"

রামকুমার ঝামাপুকুরে এসে টোল খুললেন।

ছাত্র জুটতে লাগল কিছু কিছু। মাসে মাসে যা পারেন তাই-ই পাঠান। ওতেই কোন মতে চালিয়ে নেন চন্দ্রমণি।

রাজভোগ খেতে তো কেউ চায় না। ডাল ভাত হলেই যথেষ্ট। সেজন্য কারুর মনে কোন দুঃখ আপসোস নেই।

কামারপুকুরের মেয়েরা অবাক্ হয়ে যায়—চন্দ্রমণি এমন সুন্দর ভাবে সংসার চালান কি করে! পুষ্যিও কম নয়, তাছাড়া সাধুসন্তদের পদধূলি লেগেই আছে।

কেউ কেউ বলে, "রঘুবীর ঠাকুর রয়েছেন ঘরে। তাঁরই কৃপা।"

সীতানাথ পাইনের মেয়ে রুক্মিণী বলে, "শুধু তাই নয়। আরও একটি জ্যান্ত ঠাকুর রয়েছে যে। গদাধর।"

কামারপুকুরের মেয়েরা শ্রদ্ধা করে চন্দ্রমণিকে। গদাইকেও তারা ভালবাসে, মনে মনে কেউ কেউ ভক্তিও করে। ক্ষুদিরামকেও সকলে শ্রদ্ধা করত। দেখলে মাথা নুইয়ে প্রণাম করত—সসম্মানে ছেড়ে দিত পথ। গদাধর পথে চললেও সবাই পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে! এ যেন ক্ষুদে ক্ষুদিরাম!

সীতানাথ পাইনের মেয়ে রুক্মিণীর শ্রদ্ধা ভালবাসা গদাধরের ওপর একটু বেশী। সীতানাথেরও অশ্রদ্ধা নেই। তাছাড়া দেবদ্বিজে ভক্তি আছে! মাঝে মাঝেই বাড়িতে কীর্তনের আসর বসে। গদাধরকে ডেকে নেয়। বলে, "আমার বাড়িতে কীর্তন কর।"

গদাধর আপত্তি করে না। যায়। ঘেরা আঙিনায় বসে গানের আসর। বাড়ির মেয়ে বউরা বেশী রকম পর্দানশিন। পথে বের হয় না। পরপুরুষের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। অথচ গদাইয়ের কাছে কারুর কোন সংকোচ নেই। তার সামনে বসে সবাই গান শোনে, তার সঙ্গে কথা বলে, হাসি ঠাট্টা করে।

দুর্গাদাস পাইনের তা সহ্য হয় না। সীতানাথেরই প্রতিবেশী তিনি। বলেন, "অন্য বাড়ির পুরুষকে অন্দরমহলে এমন ভাবে ঢুকতে দেওয়া কেন? হোক হরিনাম, তবু বাইরের ছেলের সঙ্গে মেয়েদের এত ঢলাঢলি—এসব কি!"

"গদাধর ভাল ছেলে। ওর সঙ্গে অন্য মানুষের তুলনা?"

"হাজার ভাল হোক। বাড়ির মেয়েদের মান-সম্ভ্রম বলে তো একটা কথা আছে! কই, আমার বাড়িতে তো এমন হয় না? বাইরের কোন পুরুষ মানুষ ঢুকুক তো আমার বাড়িতে!"

লোকের কাছে এমনি করে হম্বিতম্বি করে বেড়ান দুর্গাদাস। সন্ধ্যাবেলায় ইয়ার-বন্ধুরা আসেন। তাদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে গল্পগুজব করেন।

এমনি একদিন গল্পগুজব করছিলেন সন্ধ্যাবেলায়। এমন সময়

একটি মেয়ে এসে হাজির। দেখে মনে হল তাঁতীদের কোন মেয়ে। পরনে হাতে বোনা মোটা আধ-ময়লা শাড়ি, হাতে রুপোর পৈঁছা, কাঁখে চুবড়ি। আধ-ঘোমটা টানা মুখ, ভাল করে মুখ দেখা যায় না।

"কি চাও ?" প্রশ্ন করলেন দুর্গাদাস।

"আজকে রাতের মত কোথাও একটু থাকতে চাই।" মেয়েটি লজ্জায় জড়সড় হয়ে জবাব দিলে।

"আসছ কোত্থেকে ? হয়েছে কি তোমার ?"

"বাড়ি থেকে এসেছিলাম হাটে সুতো বেচতে। বেচতে একটু দেরি হয়ে গেল। সঙ্গে যে সব মেয়েরা এসেছিল তারা চলে গেছে আমাকে ফেলে। অনেক দূরে বাড়ি। সন্ধ্যার পর একা ফিরতে ভয় করছে।"

"তা এসব ব্যাপার আমার কাছে কেন ? বাড়ির মেয়েদের কাছে যাও। তারাই ব্যবস্থা করবে।" অনেকটা বিরক্তির সুরেই যেন বললেন দুর্গাদাস।

মেয়েটি চলে গেল অন্দরমহলে।

ঠাঁই মিলল সেখানে। সারা রাতের জন্য ঠাঁই। মেয়েটি কথা-বার্তায় কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাইকে যেন আপন করে ফেলল।

"ঐ দাওয়ায় এক কোণে শুয়ে আমি রাত কাটিয়ে দেব।"

"সে কি ! না খেয়ে শুয়ে থাকবে ? হাত মুখ ধোও, কিছু খাও।"

মুড়ি-মুড়কি নাড়ু মোয়া এল। দিব্যি রাত্তিরের জলযোগ হয়ে গেল।

এবার শুরু হল গল্পগুজব। কত গল্পই যে জানে মেয়েটি। বাড়ির মেয়েরা তাকে ঘিরে বসল। গল্প আর ফুরোয় না।

রাত বেড়ে চলল।

গদাই ফেরেনি বাড়িতে। চন্দ্রমণি বললেন, "ছেলেটাকে খুঁজে ছাখ্। কোথায় গেল আবার।"

রামেশ্বর বললেন, "কোথায় আর যাবে? সীতানাথের বাড়িতেই আছে হয় তো। সেখানেই তো দিন রাত পাঠ কীর্তন করে।"

"তবু খুঁজে ছাখ্। রাত হয়ে গেল। এত রাত তো সে করে না কখনো। কোথাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কি না কে জানে!"

রামেশ্বর বের হলেন। গেলেন সীতানাথের বাড়িতে। সেখানে আসেনি গদাধর। তাহলে কোথায় গেল!

"গদাই! গদাই! গদাই রে—"

জোরে হাঁক ছেড়ে রামেশ্বর ফিরতে লাগলেন পথে পথে।

ছুর্গাদাস পাইনের বাড়ির কাছ দিয়ে যাবার সময়েও হাঁক দিলেন।

"গদাই! গদাই রে—"

গল্প করতে করতে চমকে উঠল তাঁতী মেয়েটি। গল্প গেল বন্ধ হয়ে। লাফিয়ে উঠল হঠাৎ।

"যাচ্ছি গো দাদা—যাচ্ছি।"

ছুটে বাইরে চলে গেল মেয়েটি। বাড়ির মেয়েরা অবাক্। সব গিয়ে বলল ছুর্গাদাসকে। ছুর্গাদাসও হতভম্ব। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "প্রভু আমার দর্প চূর্ণ করলেন।"

এ যেন শ্রীকৃষ্ণেরই ভাবলীলা। কৃষ্ণও গোপিনী সেজে লীলা করেছিলেন মেয়েদের সঙ্গে।

মেয়েলীপনা রয়েছে গদাধরেরও। চলনে বলনে মেয়েলী ভাব। তাই তো মেয়েরা ঠাট্টা করে কেউ কেউ তাকে বলে—রাধারানী। তাতে রাগ করে না গদাধর।

ঠাকুর পরবর্তী কালে বলেছিলেন, "আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়।"

ধর্মদাস লাহার মেয়ে প্রসন্ন কিন্তু গদাধরকে বলে—গোপাল। গোপাল কৃষ্ণ!

পাঁচ

বিকেলবেলা। ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন চন্দ্রমণি। হৃদয় ছুটতে ছুটতে এসে ডাকল, “দিদিমা গো!”

চমকে উঠলেন চন্দ্রমণি, “কি হয়েছে রে?”

“মামা কেষ্ট সেজেছিল। পা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশিটা যেই মুখে তুলেছে, ব্যস অমনি বেহুঁশ।”

“কোথায়? চল্ তো দেখি!”

ছুটে চললেন চন্দ্রমণি। গা কাঁপছে, অবশ হয়ে আসছে পা।

“গদাই! গদাই রে!”

“এই তো মা আমি তোমার সামনে। ডাকছো কেন?”

চন্দ্রমণি দেখলেন, সামনেই গদাই, টলতে টলতে আসছে। চোখ যেন ঘুমে আচ্ছন্ন।

গদাইকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, “হৃদে বলছে, তুই বেহুঁশ হয়েছিস।”

“কই, হইনি তো? কি রে, তুই বলেছিস হৃদে?”

“বলেছি তো। হওনি তুমি? সবাই তো দেখেছে।”

“ধেৎ···ওর কথা তুমি শুনো না মা। হৃদেটা ভারী পাজী।”

চন্দ্রমণি ধমকে ওঠেন ছেলেকে। “এমনি করে কতদিন চলবি? পনের বছর বয়স হল। বুদ্ধি শুদ্ধি কবে হবে তোর?”

“কিসের বুদ্ধি মা?” গদাই যেন হতবুদ্ধি।

“কেষ্ট বিষ্টু সাজতে হবে না। বাঁশি বাজাতে হবে না।”

“বেশ, সাজবো না। বাজাবো না বাঁশি।”

কিন্তু ছেলেকে শাসন করতে গিয়েও থেমে যান চন্দ্রমণি। ছেলের মনে আঘাত দিয়ে ফেললেন না তো!

কৃষ্ণ-গোপালকে বাঁশি বাজাতে নিষেধ করছেন মা যশোদা! এ কেমন কথা! মুখে হাসি, হাতে বাঁশি, পায়ে নূপুর—এই তো কৃষ্ণের আসল রূপ! আনন্দময় নওয়ল কিশোর!

পল্লীর পথে মাঠে ঘুরে বেড়ায় গদাধর। সঙ্গে ভাগনে হৃদয়। ছায়ার মত মামার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

ক্ষুদিরামের বোন রামশীলার মেয়ে হেমাঙ্গিনী। হেমাঙ্গিনীর ছেলে হৃদয়। হৃদে। পিসতুতো বোনের ছেলে। ভাগনে। এই ভাগনেই এখন গদাধরের নিত্যসঙ্গী।

একদিন সকাল থেকে পাত্তা নেই গদাধর আর হৃদয়ের। ফিরল বিকেলবেলা। গদাধর আপন মনেই বলতে বলতে এল, "ছিঃ, ওরা নাকি আবার লেখাপড়া জানে।"

চন্দ্রমণি ঘর থেকে বেরিয়ে রাগ করে বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

গদাই বলল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।"

"কি দেখছিলি?"

"জমি ভাগাভাগি করছে! মাপছে দড়ি ফেলে। তাতেও হল না। লাগল ঝগড়া, তারপর হাতাহাতি। খুড়ো ভাইপো দু'জনেই পণ্ডিত। অথচ কী মারামারিই করলে দু'জনে। ছিঃ, বলিহারী এমন বিদ্যায়! এমন বিষয়-সম্পদেও ধিক্।"

চন্দ্রমণি বললেন, "ওদের বিষয়-সম্পত্তি ওরা বুঝে নেবে না? তোর এত মাথা ব্যথা কেন?"

"মাথা ব্যথা হবে না? দু'হাত জমির জন্য খুড়ো ভাইপোতে লাঠালাঠি ফাটাফাটি করবে, এটা কেমন কথা! বলিহারি ওদের

বিদ্যা! বিষয়-সম্পত্তি থাকাও দেখছি ঝকমারি। বিষয় না বিষ!"

লাহাবাবুদের বাড়িতে অতিথিশালা। সেখানে অনেক সাধুরা আসেন। বেদ-বেদান্তের আলোচনা হয়, পুরাণ-ভাগবতের পাঠ হয়। গদাধর কখনো কখনো গিয়ে বসে সেখানে। পাঠ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়।

চন্দ্রমণি বলেন, "ঘরের দিকে গদাইয়ের মন নেই। কি যে ওর পরিণাম হবে!"

রামেশ্বর বলেন, "এবার দাদা কলকাতা থেকে এলে বলে দিও সব কথা। এখানে পড়াশোনা হচ্ছে না। দাদা ওকে কলকাতায় নিয়ে যাক।"

"তাই বলব এবার।"

রামেশ্বর মুখে কিছু বলেন না গদাইকে। ওকে দিয়ে সংসারে কোন সুখ হবে এ আশা তিনি ছেড়েই দিয়েছেন। নিজের খেয়াল নিয়েই মেতে থাকে গদাধর।

সরস্বতী পুজো এসে গেছে।

মূর্তি গড়ছে কুমোররা। শেষ হয়নি গড়া। কোনটা দোমেটে, কোনটায় বা এক পোঁচ রং দেওয়া। বসে বসে দেখে গদাধর আর হৃদয়।

কাশীনাথ নামকরা কারিগর। বুড়ো হয়েছে, কিন্তু মূর্তি গড়ে ভালো। গদাধরকে দেখে জিজ্ঞেস করে—"কি গো, বসে বসে তো দেখছ, কেমন লাগছে তোমার? কেমন হচ্ছে ঠাকুর গড়া?"

গদাই জবাব দেয় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ফিক ফিক করে হাসে।

"এ কি, হাসছ কেন? কেমন হয়েছে বল না?"

"উঁহু, মোটেই ভালো হয়নি। চোখ যেন কেমন হয়েছে!"

সরস্বতী, বিদ্যাদায়িনী, বেদমাতা। তাঁর চোখ হবে ভাবগম্ভীর। কিন্তু কেমন যেন কঁ্যাটকঁ্যাট করছে। চোখে লাজ-মধুর ভাব না ফুটলে কি সরস্বতী প্রতিমা হয়?

গদাইয়ের কথা শুনে অবাক্ হয়ে যায় কাশীনাথ। দশ গাঁয়ের লোক তার প্রতিমা গড়ার প্রশংসা করে আর এই ছেলেটি বলে কি না ভালো হয়নি। পাগল আর কাকে বলে!

ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে কাশীনাথের চোখে মুখে। বলে, "মুরোদ যদি থাকে তবে গড়ে দাও না একটা। আমি দেখি।"

"মাটি দাও, রং দাও। তবে তো প্রতিমা গড়বো।"

"ঐ তো রয়েছে মাটি। রঙেরও কি অভাব আছে? গড়ো না তোমার যত খুশী।"

গদাই মাটি নিয়ে প্রতিমা গড়তে বসে।

যেমন করে সাধক বসে সাধনায়, তেমনি যেন নীরব সাধনায় বসল গদাধর। নিজের মনের ভাব দিয়ে, সমস্ত ভক্তি উজাড় করে গড়তে লাগল প্রতিমা।

নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কাশীনাথ—কি সহজ গতিতে এগিয়ে চলছে গদাধরের হাত! কী তার ভঙ্গী—কী তার ছন্দ! সারা পৃথিবীর রূপ ও ছন্দ বুঝি ধরা দিয়েছে তার হাতে!

মূর্তি গড়া হয়ে গেল গদাধরের। সুন্দর! অপূর্ব!

কাশীনাথের অহংকারী-মন নুয়ে পড়ল এই কিশোর বালকের কাছে।

পুরীধামে যাবার পথ কামারপুকুরের পাশ দিয়ে। তীর্থযাত্রী সাধুসন্ন্যাসীরা তাই এসে থামেন কামারপুকুরে। বিশ্রাম করেন।

রঘুবীর শিলা দর্শন করতেও আসেন অনেকে। চন্দ্রমণি পরম যত্নে সেবা করেন অতিথিদের। যাবার সময় তাঁরা আশীর্বাদ করে যান।

একদিন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন গদাইয়ের দিকে। কি তিনি দেখলেন কে জানে!

চন্দ্রমণি বললেন, "আমার এই পাগল ছেলেটাকে আশীর্বাদ করে যান বাবা।"

হেসে উঠলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। বললেন, "ওকে তুমি পাগল বলছ মা? ওর মত পাগল হবার জন্যই তো গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু পাগল হতে পারলাম কই?"

সাধুরা চলে যান যে যাঁর পথে। কোন বাঁধন নেই, কোন ভাবনা নেই। নিষ্কাম, নিরাসক্ত। গদাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর কি যেন ভাবে।

হৃদয় বলে, "ওরা বেশ, তাই না?"

গদাই শুধায়, "কি রকম?"

"যেখানে যায় সেখানেই বেশ জামাই-আদরে থাকে।"

"দূর বোকা, ওরা কি জামাই যে জামাই-আদর পাবে? ওরা তো বিয়েই করেনি। ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী।"

"কিন্তু খায় তো ওরা এককাঁড়ি। আর দেয়ও সবাই।"

"দেবে না? ওদের মুখ দিয়েই তো দেব-দেবীরা খান। তাই তো ওদের খাওয়ায় সবাই।"

"চল না মামা আমরাও বেরিয়ে পড়ি। ওরকম খাবো দাবো আর বগল বাজাবো।"

এবার চঞ্চল হয়ে ওঠে গদাধর। বলে, "চুপ, মা শুনবে। মাকে কথা দিয়েছি, কখনো পরবো না সাধু-সন্ন্যাসীদের বেশ···কৌপীন··· গেরুয়া।"

গদাধরের মনে পড়ে যায় বুঝি কয়েক বছর আগেকার কথা।

লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সন্ন্যাসীদের আনাগোনা। তাঁদের দেখে গদাধর। বেশ ভালো লাগে তার।

মা তাকে একদিন নতুন কাপড় পরিয়ে দিলেন।

কিন্তু সে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল সে কাপড়। একটি ফালা নিয়ে কৌপীনের মত করে পরল।

মা দেখে অবাক্! "একি করেছিস তুই ?"

"অতিথি হয়েছি।"

"সে আবার কি ? কোথাকার অতিথি ?"

"ঐ যে লাহাবাবুদের অতিথিশালায় আসে। তারা তো অতিথি। কী আদর পায় তারা!"

মা হাসলেন। কিন্তু মনটা উঠল হাহাকার করে।

"সেই সন্ন্যাসীর বেশই তুই পছন্দ করলি ? আস্ত কাপড় দিলাম তা ছিঁড়ে তুই বানালি কৌপীন ? হায় রে!"

গদাধর হাসল। কিন্তু বুঝল মা ব্যথা পেয়েছে।

তারপর আর কোনদিন কৌপীন পরেনি গদাধর।

ছয়

"গদাইয়ের হল কি ! এমনি ভাবেই কি দিন যাবে ?"

"কি ভাবে ?"

"লেখাপড়া করবে না, কিছুই করবে না। একেবারে অমানুষ হয়ে যাবে যে শেষে।"

রামকুমার কলকাতা থেকে ফিরে গদাধরের হাবভাব দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"কি করবো বল্ ?" শুধান চন্দ্রমণি।

"ওকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব।"

"তা বাবা তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর।"

কিন্তু মনে মনে ভাবেন চন্দ্রমণি, কি করে গদাইকে ছেড়ে তিনি থাকবেন ?

রামকুমার বললেন, "ওখানে গেলে আমার নজরে থাকবে। লেখাপড়ারও ব্যবস্থা হবে। আমারও সাহায্য হবে কিছুটা। ওখানে একা আর পেরে উঠছি না মা।"

এবার সায় দেয় চন্দ্রমণির মন। "বেশ তুই নিয়ে যা ওকে।"

"কিন্তু আমার কথায় কি ও যাবে মা ? তুমি বুঝিয়ে বলো।"

চন্দ্রমণি ডাকেন গদাধরকে। কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, "বিদেশে তোর বড়দার একা খুব কষ্ট হচ্ছে। তুইও চলে যা সেখানে। একসঙ্গে থাকবি।"

গদাধর কি যেন ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর ছোট্ট শিশুর মত মায়ের কোলে মাথা গুঁজে বলে, "তুমিও তাহলে চলো মা।"

চন্দ্রমণি হেসে ওঠেন ছেলের কথা শুনে।

"আমি কি করে যাবো রে বোকা! ঘর-সংসার রয়েছে। রঘুবীর আছেন। আর আছে অক্ষয়।"

অক্ষয় রামকুমারের মা-মরা ছেলে। আঁতুড়-ঘরে ওর মা মরে যাওয়ার পর থেকে চন্দ্রমণিই ওকে লালন পালন করছেন।

"আর এটা তোর বাপের ভিটে। এ ভিটে ছেড়ে সবার কি চলে যেতে আছে?"

গদাই আর কোন কথা বলে না। উঠে যায়। কিছুই যেন ভাল লাগে না তার কাছে। এতদিনের পরিচিত কামারপুকুর ছেড়ে যেতে হবে। এই পথ এই মাঠ এই গাছপালা বনজঙ্গল আর এখানকার পরিচিত সব মানুষ।

মনটা যেন হুহু করে ওঠে।

"হৃদে! ওরে হৃদে!"

"কি মামা?"

"তোকে ছেড়েও আমি চলে যাব রে।"

হৃদয়ের চোখে জল। জল গদাধরের চোখেও।

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দাদার সঙ্গে কলকাতায় রওনা হল গদাধর।

এল ঝামাপুকুরে।

একটি বড় বাগানবাড়ির মধ্যে একখানা ঘর। রামকুমারের টোল। চওড়া বারান্দা। এক পাশে চাটাই দিয়ে ঘেরা রান্নার জায়গা। আর এক পাশে ছেলেরা বসে পড়ে।

"কিরে কেমন লাগছে কলকাতা শহর? দেখছিস তো কত বড় বড় বাড়ি। কত গাড়ি ঘোড়া।"

গদাধর দেখে। ভালও লাগে। কিন্তু মন হুহু করে।

বাড়ির জন্য কেমন করে যেন। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

ছাত্ররা টোলে পড়াশোনা করে। গদাধর মন দিয়ে শোনে। ন্যায়ের কূট তর্ক, দর্শন……

রামকুমার বলেন, "তোকেও লেখাপড়া শিখতে হবে। ষোল সতের বছর বয়েস হল, কিছুই তো শিখলি না!"

"কি শিখবো দাদা?"

"শাস্ত্র, ব্যাকরণ—। আমার অবস্থা দেখছিস তো! নুন আনতে পান্তা ফুরায়! পুজোর মন্ত্র তন্ত্র শিখলে তবু একটু কাজ হবে।"

"চাল কলা বাঁধা বিদ্যে শিখে কি হবে দাদা?"

"তাহলে কি শিখবি? কি চাস তুই?"

"আমি চাই জ্ঞান।"

রামকুমার অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকেন গদাধরের দিকে। বলে কি! কি জ্ঞান চায় সে?

রামকুমার একা পেরে ওঠেন না। টোলে ছাত্র পড়ানো আছে, আর আছে যজমানদের বাড়িতে পুজো করা।

গদাধরকে বলেন, "চল, তুইও চল্ আমার সঙ্গে। কাছে থেকে একটু আধটু কাজ করে দিলেও তো আমার অনেক আসান হয়।"

গদাধর যায়। ঘরে একা বসে থেকেই বা করবে কি?

দেখে দেখে শেখে। দাদার কাজের বোঝা হালকা করে দেয়।

যজমান বাড়ির মেয়েরা অবাক্ হয়ে যায় পুজো দেখে। পুজোর আসনে বসে তন্ময় হয়ে যায় গদাই।

এমন না হলে পুজো! কী নিষ্ঠা! কী ভক্তি!

মেয়েরা ভক্তিতে গদগদ হয়ে প্রণাম করে তাদের নতুন পুরোহিতকে। পরম আদরে বসে ফল দুধ সন্দেশ খাওয়ায়। বিদায়ের সময় দক্ষিণা দেয় বেশী করে।



শ্রীমা সারদামণি

গদাধর বলে, "আমাকে এত সব দিচ্ছ কেন গো!"

মেয়েরা বলে, "পুজো করলে যে বাবা।"

"পুজো করলাম তো এত পাওনা কিসের?"

"আপনি কি মিছিমিছি খাটবেন?"

"মিছিমিছি কোথায়? পুজো করলাম, ঠাকুরকে ডাকলাম প্রাণ ভরে। এটা কি কম পাওনা হল?"

অবাক্ হয়ে তাকায় মেয়েরা গদাধরের দিকে। বলে কি! এমন মানুষ তো চোখে পড়ে না তাদের!

চোখে পড়বে কোত্থেকে? দেবতার দর্শন কি সহজে মেলে? সে যে দুর্লভ-দর্শন!

বাড়ি ফেরবার পথে অনেক কিছু বিলিয়ে দেয় ভিখারীদের। চাল কলা এমন কি পয়সাও। কোন কোন দিন খালি হাতেই ফেরে গদাধর।

রামকুমার জিজ্ঞেস করেন, "কিরে, আজ পেলি না কিছু?"

উদাস ভাবেই গদাধর জবাব দেয়, "পেয়েছিলাম, সব দিয়ে দিয়েছি ভিখারীদের।"

"কেন দিলি?"

"চাইলে যে! ওরা চাইলে কি না দিয়ে পারা যায়?"

"এদিকে আমাদের চলবে কি করে?"

"আমাদের তবু তো কিছু আছে। ওদের যে কিছুই নেই। আহা, কি কষ্ট ওদের!"

রামকুমার চুপ করে যান। কোন কোন দিন বা তিরস্কার করেন। কিন্তু বোঝেন তিরস্কারেও কোন ফল হবে না। গরিবের ঘরে হলেও রাজার মন নিয়ে গদাধর জন্মেছে।

টোল ঘরের সামনে খানিকটা খোলা জমি। জবা, জুঁই, বেল ও

অতসীর চারা লাগিয়েছেন রামকুমার। ফুলও ধরেছে গাছে গাছে। লতাপাতায় ও ফুলে বেশ একটা সুন্দর পরিবেশ।

রামকুমার সেদিন একটু আগেই ফিরেছেন। বসে আছেন খোলা বারান্দায়। এমন সময় এল গদাধর। মিত্তির বাবুদের বাড়ি থেকে পুজো করে ফিরল।

দাদার পাশেই বসে পড়ে বলল, "দাদা, তুমি নাকি এক কাঁড়ি টাকা নিয়েছ জেলে বউটার কাছ থেকে ?"

অবাক্ হয়ে যান রামকুমার। "কার কথা বলছিস্ ?"

"জানবাজারের রানী রাসমণির কথা গো! মিত্তিররা বলছিল, খুব ডাঁটালো লোক নাকি ওরা। মাতাল গোরা পল্টনদের ঠেঙ্গিয়ে তাড়ায়। টাকাও যেমন, দেমাকও তেমন। তবে জাতে ছোট! কৈবর্ত।"

"তা তো জানি। কিন্তু কি শুনেছিস সে সম্বন্ধে ?"

"মিত্তিরদের বাড়িতেই শুনলাম। কে যেন ওদের বলেছে। তুমি নাকি পাঁতি দিয়েছ রাসমণিকে সব বামুন পণ্ডিতদের মতের বিরুদ্ধে!"

"হ্যাঁ দিয়েছি তো! দেব না? তাই বলে টাকা নেব আমি ক্ষুদিরাম চাটুয্যের ছেলে!"

"আমিও তাই শুনিয়ে দিলাম মিত্তির বাবুদের। কামারপুকুর গাঁয়ের জমিদার লাহাবাবুদের দানও বাবা নেন নি। আর তাঁর ছেলে নেবে কৈবর্তের হাতের দান ?"

"ঠিক বলেছিস। আসলে কি জানিস, হিংসায় লোকেরা এসব রটাচ্ছে। কিন্তু আমি তো শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন পাঁতি দেইনি। শাস্ত্রমতেই দিয়েছি।"

"তাই জন্যে এত ?"

"সিয়রের মহেশ চাটুয্যেকে চিনিস তো? রানী রাসমণির সেরেস্তায় কাজ করে। আমার কাছে এল ব্যবস্থার জন্য। রানী

দক্ষিণেশ্বরে বিরাট মন্দির করেছেন। কিন্তু করলে কি হবে? কোন ব্রাহ্মণ সেই মন্দিরে পুজো করতে চায় না। বলে, ছোট-জাতের প্রতিষ্ঠা করা ঠাকুরের পুজো আমরা করতে পারব না।"

"এটা কেমন কথা গো!"

"তাই তো মহেশ এল আমার কাছে ব্যবস্থা নিতে। আমি দেখে শুনে বিচার করে বললাম, সমস্ত জমাজমিসুদ্ধ মন্দির কোন ব্রাহ্মণের নামে দান করলেই ব্রাহ্মণ পূজকের হাতে অন্নভোগ চলতে পারে।"

"তারপর এখন কি হল?"

"ক'দিন আগে মহেশ আবার এসেছিল। বলল, রানী তাঁর কুলগুরুর নামে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সব কিছু দান করে দিয়েছেন। গুরুর নামেই কালীর প্রতিষ্ঠা হবে। গুরুর অছি হিসেবে রাসমণি শুধু দেখাশোনা করবেন।"

গদাইয়ের কিন্তু ভাল লাগল না এ সব কথা। সে বলল, "এত সব করার কি দরকার ছিল? কালী কি শুধু বামুনদেরই মা?"

রামকুমার বললেন, "তা হবে কেন? মা সবারই মা। নিজের ঘরে ছেলে আপন মায়ের কোলে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। নিষ্ঠা নীতির কোন বালাই নেই। কিন্তু সেই মাকে সবার সামনে এনে বসাতে গেলে আসনটাও উঁচু করতে হয়, মান্য করেও চলতে হয়।"

গদাধর কোন কথা বলে না। মনে মনে কি যেন ভাবে।

রামকুমার বলেন, "মন্দির গড়ে প্রকাশ্যে দেবীর প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিদিন অন্নভোগ দেওয়া, এসব তো ঘরোয়া ব্যাপার নয়। কাজেই চলতি নিয়ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলাই দরকার।"

গদাধরের মন কিন্তু সায় দেয় না এসব কথায়।

সে শুধু ভাবতেই থাকে।...এসব তো লোক-দেখানো লোকাচার! তা ছাড়া কি!

সাত

রানী রাসমণি কাশী যাবেন, তার আয়োজনই আলাদা।

সঙ্গে যাবে দাসদাসী, পাইক পেয়াদা, অন্ন বস্ত্র অর্থ। একশো নৌকা বোঝাই। নৌকার উপর একটা জমিদারি।

এমন আয়োজন রাসমণির থাকবে না তো থাকবে কার? কৈবর্তের মেয়ে হলে হবে কি, অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। কলকাতার জানবাজারে তাঁর বিরাট রাজপুরী।

বিয়াল্লিশ বছরে বিধবা হলেন। স্বামী রাজচন্দ্র দাসের বিষয়-সম্পত্তি নিজের ক্ষমতায় বাড়িয়ে তুললেন দশগুণ। সেজ জামাই মথুরামোহন বিশ্বাস তাঁর ডান হাত। যা কিছু করেন, মথুরামোহনের সঙ্গে পরামর্শ করে করেন।

মথুরামোহনকে রানী বিশ্বাস করেন খুব। ভালবাসেন ছেলের মত। তাই সেজ মেয়ে করুণাময়ী মারা যাবার পর ছোট মেয়ে জগদম্বার বিয়ে দিলেন মথুরার সঙ্গে।

ছোটবেলা থেকেই আদ্যাশক্তি মা কালীর প্রতি তাঁর ভক্তি। স্বামী মারা যাবার পর মানত করলেন, বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার যোগ্য লোকের হাতে দিয়ে কাশীধামে যাবেন, অন্নপূর্ণার মন্দিরে করবেন অন্নকূট উৎসব।

এতদিনে সময় হল। মথুরামোহনের হাতে সব কিছু দেখা-শোনার ভার দিয়ে চললেন কাশীতে।

নদীপথে একশো ডিঙার শোভাযাত্রা। ভরা ডালি হাতে নিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন রানী রাসমণি।

রানী ঘুমিয়ে পড়েছেন। গঙ্গার পথে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এসেছে তাঁর বজরা। তখন রাত। স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। জগন্মাতা মহাকালী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন "কাশী যাবার দরকার নেই। গঙ্গাতীরে মন্দির তুলে আমায় প্রতিষ্ঠা কর্। আমাকে অন্নভোগ দে।"

মাতৃমূর্তি স্বপ্নে মিলিয়ে গেল। ঘুম ভেঙে গেল রানীর। চিৎকার করে বললেন, "ওরে নৌকা ফিরিয়ে নিয়ে চল। আর কাশী যেতে হবে না। এখানেই গঙ্গাতীরে হবে মূর্তিময়ী জগদম্বার পুজো।"

সাজানো নৌবহর ফিরিয়ে আনা হল। মথুরামোহন বের হলেন জমির খোঁজে। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমি চাই।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর দক্ষিণেশ্বর গ্রামে একলপ্তে ষাট বিঘে জমি পাওয়া গেল। অর্ধেকটা ইংরেজ হেস্টিং সাহেবের, বাকীটা এখানকার কবরখানা, গাজী পিরের থান। জমির মাঝখানটা উঁচু, চারদিকটা ঢালু—কচ্ছপের পিঠের মত। তন্ত্রমতে শক্তিসাধনার উপযুক্ত জায়গা।

রাসমণি বললেন, "মথুর, ঐ জমিটাই কেনো। যত দাম লাগে লাগুক।"

জায়গা কেনা হল। তৈরী হল মন্দির। ব্যয় হল নয় লাখ টাকা। রাধাগোবিন্দের মন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির, ভবতারিণী মা কালীর মন্দির, নাটমণ্ডপ, নহবতখানা, অতিথিশালা, বাবুদের কুঠি, ভাঁড়ার ঘর, দপ্তরখানা, পূজারীদের ঘর, মালী চৌকিদারের ঘর, ফটক দেউড়ি—সে এক বিরাট ব্যাপার। এই সব করতে লেগে গেল প্রায় দশ বছর।

মন্দির তৈরী শেষ হল। দেবীমূর্তিও গড়া হল। এখন বাকী রইল দেবী-প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু বেঁকে বসলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা। তাঁরা বললেন, "এটা

অনাচার। মন্দির তুলে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করতে পারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা। অন্নভোগ দিতে পারে একমাত্র সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণেরা। আর কেউ পারে না। কৈবর্তের মেয়ে রাসমণি তো পারেন না কিছুতেই।”

তাহলে কি হবে? দেশে দেশে লোক পাঠালেন। কিন্তু সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মুখেই এক কথা। কোন ব্রাহ্মণ পুজো করবে না শূদ্রের মন্দিরে।

রানী রাসমণি কাঁদতে লাগলেন।

“তুমি কাঁদছ কেন মা? মহেশ চাটুয্যেকে পাঠিয়েছি ঝামাপুকুরে। রামকুমার বিজ্ঞ লোক। দেখি কি বিধান দেয়।” মথুর বিশ্বাস আশ্বাস দিলেন রানীকে।

রামকুমারের বিধান এল। রানী যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন তবে অন্নভোগ চলতে পারে।

অন্ধকারের মধ্যে রানী দেখতে পেলেন আলোক।

কিন্তু এ বিধানও নাকি অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মনঃপূত নয়। না হোক মনঃপূত! রামকুমারের মত পণ্ডিতলোকের বিধান—এর কি কোন দাম নেই?

রাসমণি ঠিক করলেন তাঁর গুরুর নামে দক্ষিণেশ্বরের সব সম্পত্তি দান করে দেবেন। কিন্তু পূজক কে হবে? গুরুবংশের কেউ হলে নানা কথা উঠবে। চাই অন্য বংশের। অন্য গোত্রের।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পূজক নিযুক্ত হলেন মহেশ চাটুয্যের ভাই ক্ষেত্রনাথ। কিন্তু কালী ভবতারিণীর পূজক কে হবে? ভৈরব ভট্টাচার্যকে করা হয়েছিল। সে পালিয়েছে!

শেষে রাসমণি রামকুমারকেই ধরলেন। “আপনি এর ব্যবস্থা করুন।”

রামকুমার বললেন, "পূজকের অভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে না, এ কেমন কথা? বেশ, আমিই পূজক হব।"

বারোশো বারো সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস, বৃহস্পতিবার। স্নানযাত্রার শুভ দিন। মন্দির প্রতিষ্ঠা হল।

গদাধর এল দাদার সঙ্গে। হই হই ব্যাপার। কত লোকজন এসেছে দূর দূর থেকে। কামারপুকুর থেকে হৃদয়ও এসেছে। হৃদয়কে পেয়ে গদাধরের কী আনন্দ!

বিরাট উৎসব। যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবত, রামায়ণ পাঠ—কত কি হচ্ছে চারদিকে। যে দিকে যাও শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

মন্দির-দ্বারে ভোরবেলা থেকেই বাজতে লাগল মধুর সুরে সানাই। প্রহরের পর প্রহর ধরে শাস্ত্রমতে পুজো করলেন শক্তি-সাধক রামকুমার।

তৃতীয় প্রহরে বললেন, "রানীকে ডাকো প্রণাম করতে।"

রানী এলেন। সঙ্গে মথুর, পিছনে মেয়েরা ও আরো অনেকে।

চৌকিদাররা ভিড় সরিয়ে দেওয়ার জন্য হাঁকতে লাগল, "হটো, হট্ যাও—হুঁশিয়ার!"

মন্দিরের সামনে বিরাট চত্বরের এক কোণে বসেছিল গদাধর আর হৃদয়। ভিড়ের চাপে হৃদয়কে টেনে সরিয়ে নিয়ে বলল, "আয় বেরিয়ে যাই। এত ভিড় ভাল লাগে না।"

ফটকের বাইরে এসে দাঁড়াল গদাধর। পাশে হৃদয়।

গ্রাম থেকে এসেছে এক বুড়ী। ঠাকুর দেখবে, প্রসাদ নেবে। গদাধরকে দেখে শুধোয়, "কাদের ঠাকুরবাড়ি গো?"

জবাব গদাধরকে দিতে হল না। দেউড়ির পাশ থেকে কে একজন ভারিক্কী চালে বলল, "তাও জান না? জানবাজারের রানী মাইজীর মন্দির।"

দেউড়ির থামে মাথা ঠেকিয়ে মা কালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বুড়ী ফিরে চলল। গদাধর শুধাল, "চলে যাচ্ছ যে! ঠাকুর দেখবে না? প্রসাদ নেবে না?"

বুড়ী বলল, "না বাবা, জানবাজারের রানী তো কৈবর্ত।"

গদাধর বলল, "হলোই বা, তাতে কি হয়েছে?"

বুড়ী ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে।

গদাই আপন মনে কি ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। পথের দু'পাশে নানারকম দোকান। মেলা বসেছে। এক পয়সার মুড়কী কিনে চিবুতে লাগল গদাধর। বলল, "হৃদে, দাদাকে বলিস, ঝামাপুকুরে যাচ্ছি।"

হৃদয় অবাক্। "সে কি, যাবে কেন? প্রসাদ নেবে না?"

"না।"

হৃদয়ও হেঁটে চলল গদাধরের সঙ্গে। কিছুটা এগিয়েই বলল, "দাঁড়াও মামা, আমিও যাবো। বড়মামাকে বলে আসি।"

"না। তুই থাক। দাদা যদি যান তবে তাঁর সঙ্গে যাবি।"

হন হন করে হেঁটে চলল গদাধর। হৃদয় হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল। গদাধর চোখের আড়াল হতেই ফিরে এল মন্দিরে, বড়মামার কাছে।

রামকুমার বললেন, "গদাইকে ডাক। প্রসাদ নে।"

ভয়ে ভয়ে হৃদয় বলল, "ছোটমামা ঝামাপুকুরে চলে গেছে।"

অবাক্ হয়ে রামকুমার বললেন, "সে কি! চলে গেল কেন?"

তিনজনের মত ভোগের প্রসাদ এসে গেল। রামকুমার হৃদয়কে নিয়ে বসলেন। ভোগের অন্ন মুখে দেবার আগে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক থেকে। বললেন, "পাগল! ওর খেয়াল বোঝা ভার।"

পরদিন সকাল বেলায় আবার এল গদাধর। দেউড়ির কাছে হৃদয় তার আশাতেই বসে ছিল। কাছে আসতেই হৃদয় বলল, "তুমি চলে গেছ বলে বড়মামা খুব চটেছেন।"

গদাধর বলল, "তুই বলিস, আমিও চটেছি। দাদার কি এখানে বসে থাকলেই হবে? টোল চলবে কেমন করে?"

রামকুমারের সঙ্গে সেদিন দেখা হল না গদাধরের। বিরাট অনুষ্ঠান, সারতেও সময় লাগে। তাই কাল যেতে পারেন নি। আজও কাজে ব্যস্ত খুব।

দাদা কি এখানেই থেকে যাবেন নাকি? বড়লোকের ঠাকুর-বাড়িতে বেতন নিয়ে পুজো করে পিরালি বামুনরা। দাদা তাই করবেন? ছিঃ!

আজও না খেয়ে গদাধর ফিরে গেল ঝামাপুকুরে। এতটা পথ হেঁটে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। খেল না কিছুই।

টোলের ছেলেরা এসে ফিরে গেল। যজমান বাড়ি থেকে লোক এল ডাকতে। কোথাও গেল না সে। ছ সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বর-মুখীও হল না।

দক্ষিণেশ্বরের উৎসব শেষ হয়ে গেল। দূর থেকে যারা এসেছিল তারা ফিরে যেতে লাগল যার যার গাঁয়ে। হৃদয়ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে গেল।

দাদা এলো না এখনও।

ছ সাতদিন বাদে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির হল গদাধর।

"দাদা, তুমি যাবে না! এখানে থাকবে নাকি?"

"রানীমা বড্ড ধরেছেন রে, তাঁর কথা ফেলি কি করে? লাখ লাখ টাকা খরচ করে মন্দির করেছেন। এখন আমার উপরেই তাঁর ভরসা।"

"কিন্তু এই যজমানি কাজ করবে? লাহাবাবুদের কাছ থেকে বাবা দান পর্যন্ত নেন নি।"

"যজমানের কল্যাণে শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নিত্যপূজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। ব্রাহ্মণের মর্যাদা এতে ক্ষুণ্ণ হয় না রে।"

কথা বলতে বলতে দু' ভাই গঙ্গার তীরে এসে বসলেন। "তুইও চলে আয়। আমার কাছেই থাকবি।"

গদাধর কথা বলে না।

"এখানকার ভোগের প্রসাদ তুই নিস্ না কেন রে? গঙ্গাজলে ব্রাহ্মণের হাতে রাঁধা মাকে নিবেদন করা ভোগের প্রসাদী অন্ন। আমি নিচ্ছি। তুই নিস্ না কেন?"

গদাধর বলে, "অমনি নিই না।"

"রাসমণি কৈবর্তের মেয়ে বলে? হলোই বা। মায়ের প্রসাদের সঙ্গে রাসমণির কি সম্পর্ক?"

গদাধর চুপ।

"কামারের মেয়ে ধনী কামারনীর অন্ন নিয়েছিলি তো?"

"নিয়েছি।"

"সিয়রের রাখালদের সঙ্গে বসে খেয়েছিলি তো?"

"খেয়েছি তো।"

"ছুতোরবাড়ির খেতির মার হাতে ভাত ডাল রান্না খেয়েছিলি। চিনিবাস শাঁখারীর হাতে মিষ্টি খেয়েছিলি। আনুড়ে বিশালাক্ষী মায়ের বাড়ি সব জাতের মেয়েদের দেওয়া পুজোর প্রসাদ খেয়েছিলি তো খুব করে।"

"হ্যাঁ, খেয়েছিলাম তো।"

"তবে?"

"ওরা দিয়েছিল অতি যত্নের বিদুরের ক্ষুদ! কিন্তু এ যেন হেলায় ফেলায় দুর্যোধনের রাজভোগ। এতে বড্ড 'আমি' 'আমি' গন্ধ। আঁশটে গন্ধ।"

রামকুমার অবাক্ হয়ে তাকান গদাধরের দিকে।

গদাধর বলে, "মন চায় না। মা কাছে নেই যে শুধাবো। মা বললে সবই খাওয়া যায়। আবার মায়ের মত ভালবেসে দিলেও খাওয়া যায়।"

"কি করতে বলিস তবে ? ফিরে যাবো ঝামাপুকুরে ?"

"তা কি হয় ? কথা দিয়েছো তো তুমি ! আর টোলও তো ভেঙে গেছে। কেউ আর আসে না আজকাল !"

"তুই কি করবি ?"

"আমিও থাকবো তোমার কাছে। মায়ের কথায় তোমার সঙ্গে এলাম। তোমার সঙ্গেই থাকবো।"

"তাই থাক। এখানকার কিছু না খেতে চাস, নিজে রেঁধে খা। সরকারী ভাঁড়ার থেকে রোজই চাল ডাল ঘি সিধে দেয় এরা।"

"ওদেরটা নেব কেন ? বাজার থেকে কিনে নেব চাল ডাল সব কিছু।"

"বেশ তাই করিস। আমি পয়সা দেব যা দাম লাগে।"

বেশ আছে গদাই। খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়। ঝোপের ভেতর উনুন। নিজেই রাঁধে।

গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকে। রামপ্রসাদী গান গায় আপন মনে। আত্মভোলা। কোনদিন রামকুমারের ঘরে শোয়, কোনদিন শুয়ে পড়ে নহবতখানার নীচে। এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দেয়।

একদিন হৃদয় এসে হাজির। ঢিপ করে প্রণাম করল রামকুমারকে।

"তুই কোথেকে এলি ? বাড়ি থেকে নাকি ?"

"না। বর্ধমানে গিয়েছিলাম চাকরির খোঁজে। হল না। শুনলাম তোমরা দু'মামাই আছ দক্ষিণেশ্বরে। তাই চলে এলাম।"

"বেশ থাক এখানে। একটা কিছু হবেই। তুই থাকলে গদাইয়েরও সুবিধা হবে।"

"গদাইমামা কোথায় ?"

"ওখানে, ঐ ঝোপের আড়ালে।"

বড়মামা রামকুমারের ঘরে বোচকা বিছানা রেখে ঝোপের ধারে ছুটে গেল হৃদয়।

"মামা, এসে গেলাম।"

"কিরে হৃদে এলি? বেশ বেশ।"

"একি, তুমি এখানে উনুন ধরাচ্ছ কেন?"

"রাঁধবো। খেতে হবে তো!"

"বড়মামার সঙ্গে খাও না তুমি?"

"না।"

"প্রসাদ নাও না?"

"না। চিরকেলে পেটরোগা আমি। বড়লোকের মন্দিরে ঘিয়ে তেলে রান্না কি আমার সইবে?"

রানী রাসমণি এলেন ঠাকুরবাড়িতে। মা ভবতারিণীর পুজোয় বসতে যাচ্ছিলেন রামকুমার, রানী তাঁকে প্রণাম করলেন।

রামকুমার আশীর্বাদ করলেন, "জয় হোক মা!"

পুজোয় বসলেন রামকুমার। তন্ত্রমতে শাস্ত্রমতে পুজো। যেন রাজসূয় যজ্ঞ! নিরাভরণা শুভ্রবসনা ব্রতচারিণী রানী বসে রইলেন। দেখলেন তন্ময় হয়ে।

ভোগারতি হল। পুজো শেষ। রামকুমার এসে দাঁড়ালেন রানীর সামনে।

রানীর চোখে জল।

"আমি জেলে। ছোটজাতের মেয়ে। অভাগিনী।"

"কিন্তু এভাবে মায়ের পুজোই বা কজন করতে পারে মা? রোজই তো রাজসূয়!"

কেঁদে ফেললেন রাসমণি। অসহায়া বালিকা যেন।

"বৃথাই তো সব। মা তো নেন নি আমার পুজো।"

রামকুমার বললেন, "ঠাকুর দেখতে যারা আসে তারা সবাই শোনে এটা রানী রাসমণির ঠাকুরবাড়ি। শোনে রাসমণির ঠাকুর-পুজো। দেশে রাজসিক সমারোহ। এটা তোমারই তো স্তুতিবাদ।"

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রাসমণির। তাই তো!

"বাবা, আমি বুঝতে পারি নি। এ আমারই দোষ, দম্ভ, অহংকার···পাপ।"

অঝোরে কাঁদেন রাসমণি। "মায়ের মন্দির থেকে আমার এ পাপের দাগ ধুয়ে দিতে বুকের রক্ত দেব আমি।"

"না মা। এ মন্দিরের পুজারী আমি। মা যা চান আমি দেব। পুজোর যা কিছু ফল তা তোমার। যা পাপ যা দোষ তা আমার।"

কী সাংঘাতিক কথা! কেঁপে ওঠে রাসমণির সারা অন্তর। জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েন রাসমণি।

চিৎকার করে ওঠেন রামকুমার। "গদাই গদাই, দাসীদের ডেকে দে শীগগির!"

একটা থামের আড়ালে বসে দেখছিল গদাধর। সে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। ছুটে গেল না। বরং কাছে এগিয়ে এল একটু।

মায়েরই কৃপা। মুহূর্তেই অচেতনভাব কাটিয়ে উঠে বসেন রানী রাসমণি। চোখ গদাধরের ওপর।

"কে! কে!" চমকে ওঠেন রাসমণি।

গোকুলের যশোদাদুলাল না বৃন্দাবনের নন্দকিশোর!

রামকুমার বলেন, "আমার ছোটভাই গদাধর।"

কুঠিতে ফিরে এসে রাসমণি বললেন, "মথুর, মন্দিরের চৌকিদার-দের পোশাক পালটে সাদা জামা-কাপড় দাও। বলে দাও সেরেস্তার সবাইকে, কেউ যেন ওটাকে রাসমণির ঠাকুরবাড়ি না বলে। এটা মায়ের মন্দির।"

মথুরামোহন বললেন, "তাই হবে মা।"

"আর দেখ মথুর, খোঁজ নাও তো আমাদের পুরুতঠাকুরের ছোট ভাই গদাধর কোথায় থাকে। কি করে সে। কী তার চোখের দৃষ্টি! মুখের কী মিষ্টি হাসি! মনে হয় যেন কত কালের চেনা!"

গঙ্গার ধারে বসে আছে গদাধর। পাশে হৃদয়।

"মাটি নিয়ে আয় তো হৃদে!"

"মাটি!"

"হ্যাঁ, গঙ্গার এঁটেল মাটি। শিবের মূর্তি গড়ে পুজো করব।"

মাটি এনে দিল হৃদয়। গদাধর মূর্তি গড়ল। অপরূপ নটরাজ মূর্তি। প্রলয় নাচনের ছন্দ তাঁর পায়ে পায়ে।

পুজো করতে বসল গদাধর! কাছেই ছিল বনধুতুরার গাছ। ফুল তুলে নিয়ে এল। নিয়ে এল বৈঁচি ফল।

আনন্দে আত্মহারা হৃদয়। মামার পুজো দেখে আর বগল বাজিয়ে নাচে!

মথুরামোহন দেখলেন সব দূরে দাঁড়িয়ে। এ তো ছেলেখেলা নয়। এ যে মুক্ত তাপসের মহা আরাধনা!

পুজো শেষে গদাধর প্রসাদ দিল হৃদয়কে। বৈঁচি ফল। নিজেও নিল।

"এ মূর্তি কে করেছে?" কাছে এসে বললেন মথুরামোহন!

বৈঁচি চিবুতে চিবুতে বলল হৃদয়, "গদাই মামা।"

"পুজো হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে দিতে পার এ মূর্তি?"

দিতে বাধা কি? এমন কত মূর্তি অনায়াসে গড়তে পারে গদাধর।

মূর্তি হাতে পেয়ে ব্যাকুল মন মথুরামোহনের। নিয়ে গেলেন

বাড়ি। রাসমণিকে দেখিয়ে বললেন, "দেখুন মা, পুরুতঠাকুরের ছোট ভাই গড়েছে।"

রাসমণি বললেন, "বাঃ, বেশ তো!"

মথুরামোহন বললেন, "ওকে মায়ের সাজনদার করলে বেশ হয় মা।"

"পুরুতঠাকুরকে বলে দেখ। উনি যা বলেন তাই হবে।"

মথুরামোহন বললেন রামকুমারকে। "গদাধরকে রাজী করান। ওকে কাজ দিন মায়ের মন্দিরে।"

"অসম্ভব!" বললেন রামকুমার, "যে পাগলাটে লোক, ও কি রাজী হবে?"

"আপনি দেখুন চেষ্টা করে। ওকে যে চাই আমাদের।"

"আচ্ছা দেখব।"

কিন্তু গদাধর জানতে পেরেছে সব। সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। বলে, "চাকরি বাকরির মধ্যে আমি থাকতে চাই না।"

তবু রেহাই নেই। গঙ্গার ধারে বসে আছে গদাধর আর হৃদয়। এমন সময় বাগানের মালী বলল, "আপনাকে ডাকছেন সেজবাবু।"

"কোথায় তিনি?"

"কুঠিতে আছেন। আসুন আমার সঙ্গে।"

ইতস্ততঃ করে গদাধর।

"যাও না। ডাকছেন যখন।" বলল হৃদয়।

"গেলেই তো বলবে চাকরি করো। ও আমি পারবো না। তা ছাড়া মায়ের গায়ে কত গয়না। মুণ্ডুগুলো, মুকুট, হাতের মাথাটা সব সোনার। ওসব ভার নেওয়া কি চাট্টিখানি কথা?"

"ভয় কি? আমি তো আছি।"

"তুই থাকবি আমার সঙ্গে? সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি তো চাকরি করতেই চাই। একটা কিছু কাজ পেলে বাঁচি।"

"তবে যাই। বলি সেজবাবুকে।"

গদাধর যেতেই মথুরবাবু বললেন, "তুমি হবে মায়ের সাজনদার। মাকে সাজাবে তুমি, যেমন তোমার খুশী।"

"একা সাহস হয় না সেজবাবু। দামী দামী সব জিনিস। সঙ্গে হৃদে থাকে তো পারি।"

"বেশ, ও তোমার শাগরেদ থাকবে। দুজনে মিলেই কাজ করবে। কেমন?"

কাজে লেগে গেল গদাই আর হৃদয়।

ভোর হতে না হতেই মামা ভাগ্নে দু'জনেই ডালি ভরে ফুল তুলে আনে। বসে বসে গাঁথে ফুলের মালা, তৈরি করে গায়ের গয়না। গদাধর মনের মত করে মাকে সাজায়। যোগান দেয় হৃদয়।

পরম তৃপ্তিতে পুজো করেন রামকুমার।

পুজো শেষ করে রামকুমার ঘরে এসে দেখলেন; গদাধর বসে আছে।

"কিরে, বসে আছিস যে? রাঁধবি নে?"

"না।"

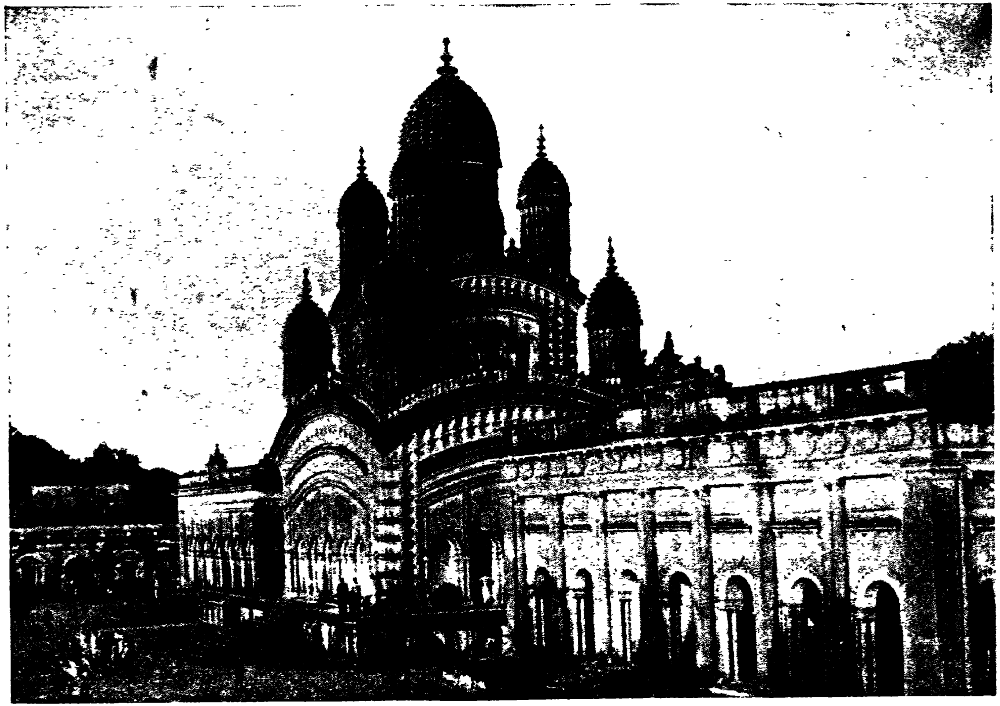
"কেন? খাবি নে? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?"

"না তো।"

"তবে?"

এমন সময় হৃদয় এল মায়ের প্রসাদী অন্নের থালা নিয়ে। রামকুমার অবাক্। কার জন্যে এত প্রসাদী অন্ন?

হৃদয় বলল, "ছোটমামা, তুমি আজ খাবে কিনা, তাই ভোগও



দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির

হয়েছে খুব খাসা। বসে পড়ো তোমরা। আমি তোমাদের দু'জনকে আগে দিচ্ছি। তারপর আমি বসব।"

গদাধর বসল রামকুমারের পাশে।

"দে হৃদে, আগে ওকে দে।" রামকুমারের চোখে যেন আনন্দের অশ্রু এল।

গদাধর মায়ের প্রসাদ নিল পরম আদরে। আজ যে এ আর দুর্যোধনের রাজভোগ নয়, বিদুরের খুদ। 'আমি'র আঁশটে গন্ধ এতে নেই। অনুতাপের অশ্রুজলে ধুয়ে গেছে রানী রাসমণির মনের অহংকার। এ অন্ন আজ সত্যি মায়ের অন্ন।

জন্মাষ্টমীর পরদিন। নন্দোৎসব।

আজ শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে বিশেষ পুজো ভোগ-রাগ।

পূজারী ক্ষেত্রনাথ রোজই দুপুরে পুজোর পর পাশের ঘরে শয়ন দিতে নিয়ে যান রাধাগোবিন্দকে। সেদিনও নিয়ে যাচ্ছিলেন।

দৈবের খেলা! পা পিছলে পড়ে গেলেন ক্ষেত্রনাথ। নিজে কোন রকমে রক্ষা পেলেন। কিন্তু শানের ওপর পড়ে ভেঙে গেল গোবিন্দের একটি চরণ।

হইচই···হাহাকার! হায় হায়, একি অঘটন!

ক্ষেত্রনাথকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল। কিন্তু বিগ্রহের কি হবে? রাসমণি বললেন মথুরামোহনকে, "পণ্ডিতদের ডাকো। তাঁদের কাছ থেকে বিধি নাও।"

পণ্ডিতরা এলেন। অনেক পুঁথি ঘেঁটে তাঁরা বিধি দিলেন—ভাঙা বিগ্রহকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে। তার জায়গায় বসাতে হবে নতুন মূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিগ্রহের ফরমাশ দেওয়া হল।

কিন্তু রানীর মনে শান্তি নেই। "যাঁকে এতদিন গোবিন্দজ্ঞানে প্রণাম করেছি, তাঁকে জলে ফেলে দেব?"

মথুরামোহন বললেন, "মা, একবার গদাধরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। দেখি সে কি বলে।"

রানী যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন। বললেন, "হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করো তাকে।"

মথুরামোহন বললেন গদাধরকে সব কথা।

"এখন কি করি বলতো ?"

শুনেই চটে উঠল গদাধর। "এই বিধানটাই আপনারা মেনে নিলেন ? রানীর জামাইয়ের যদি আজ ঠ্যাং ভাঙত, তবে রানী কি করতেন ? সেই জামাইকে জলে ফেলে দিয়ে নতুন জামাই ঘরে আনতেন ?"

মথুরামোহন হতভম্ব হয়ে গেলেন। শুধু বললেন, "না।"

"তবে ? রানী কি করতেন ? চিকিৎসা করাতেন। সারিয়ে তুলতেন পা। এখানেও সেই ব্যবস্থা।"

"ভাঙা পা জোড়া দিতে হবে ?"

"হ্যাঁ গো ! ভাঙা পা জুড়ে দিলেই ঠাকুর আবার ভালো হয়ে যাবেন।"

রানীর ভাল লাগল এ বিধান। সত্যই তো, এ যেন ঠিক মনের মত কথা।

পণ্ডিতেরা অবাক্ হয়ে গেলেন! এমন সহজ মীমাংসাও হতে পারে এর ? অনেকে বললেন, "এ অশাস্ত্রীয় ! এ কিছুতেই হতে পারে না।"

রানী বললেন, "মনের কাছে আবার শাস্ত্র কি।"

গদাধরকে বললেন, "তুমিই ঠাকুরের ভাঙা পা জুড়ে দাও। ওস্তাদ কারিগর তুমি।"

মন্দিরের নিরালায় বসে গদাধর রাধাগোবিন্দের পা জুড়ে দিল। আশ্চর্য ! দেখে বোঝা যায় না কোন্ পা ভেঙেছিল আর কোন্ পা ছিল আস্ত।

ফরমাশ দেওয়া মূর্তিও এসে গেল। মথুরামোহন বললেন, "দেখ তো আগেকার মত হল কি না।"

গদাধর দেখল। চোখ দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে। বলল, "না, একরকম হয়নি। একরকম কি হতে পারে?"

রাসমণি বললেন, "দরকার নেই নতুন বিগ্রহের। পুরনে বিগ্রহেরই পুজো হবে।"

কিন্তু তর্কবীর পণ্ডিতেরা বাধা দিলেন। নাটমন্দিরে আবার সভা বসল। এলেন বৈষ্ণবাচার্যের দল। এক কোণে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে বসল গদাধর। রামকুমার, মথুরামোহন সবাই এলেন। চিকের আড়ালে বসলেন রাসমণি।

আলোচনা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠল সভায়।

ভাঙা প্রতিমার পুজো করা কিছুতেই চলতে পারে না। ভূ-ভারতে কেউ যা কোনদিন করেনি এঁরা গায়ের জোরে তা করবেন! এ হতে পারে না।

গদাধর বলল, "পুজোটা কার, মূর্তির না গোবিন্দের?"

"পুজো তো গোবিন্দেরই। তাই বলে ভাঙা গোবিন্দের—"

"কি তোমাদের বুদ্ধি গো! যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার তিনি কি কখনো ভাঙা হন?"

অনেকেই চুপ করে যান সে কথা শুনে। যুক্তি আর খুঁজে পান না। দু'একজন বললেন, "কিন্তু দরকার কি মূর্তিতে খুঁত রেখে!"

"যিনি নিখুঁত তার কি খুঁত থাকতে পারে!" ··গদাধর ছুটে নিয়ে আসে গোবিন্দের মূর্তি। সবার সামনে বলে, "কোথায় ভেঙেছে! কোন্‌খানে খুঁত?"

সত্যি! কোথাও খুঁত নেই তো! নুয়ে পড়ে তার্কিকদের মাথা। গদাধরের হাতে হাসছেন নবজলধর বনমালী ··অখণ্ডমণ্ডলাকার গোবিন্দ!

আট

গদাধর এবার হল রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজক। আর হৃদয় হল ভবতারিণীর সাজনদার।

কিন্তু এ কেমন ধারা পুজো!

মূর্তির দিকে তাকায় না। মন্ত্র বলে নিজের মনে। চোখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। ধ্যান করে বুঝি।

কার ধ্যান? মূর্তিটা যেন কিছুই নয়। এ কেমন পুজো?

পুজো নয়ত কি? মূর্তির সামনে বসে মন্ত্র আওড়ালেই কি পুজো হয়? তাতেই কি ভগবান্ খুশী হন?

"ভগবান্ ভক্তির বশ। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য—এই সব তিনি চান।···ভক্তিই সার।"

রামকুমার খুশী। মন্দিরের কাজে মন দিয়েছে গদাধর। কিন্তু যার জন্য কলকাতায় আসা তা আর হচ্ছে কই? টাকা রোজগারের দিকে মোটে খেয়াল নেই গদাধরের।

মন্দিরের কাজ সেরে কোথায় সরে পড়ে। হৃদয়ও তাকে খুঁজে পায় না।

"গদাই, কোথায় থাকিস? হৃদে বলছিল, তোকে সে দেখতে পায় না। যাস কোথায়?"

"মায়ের নাম জপ করি জঙ্গলে বসে।"

"জঙ্গলে কেন? ঘরে করতে পারিস না?"

"মনে বনে নির্জনেই তো করতে হয় জপ।"

ঠিক কথা। তাই তো ঠাকুর বলেছিলেন—'প্রথম অবস্থায় একটু

নির্জনে বসে মন স্থির করতে হয়। তা না হলে অনেক কিছু দেখে শুনে মন চঞ্চল হয়। যেমন দুধে জলে একসঙ্গে রাখলে মিশে যায়, কিন্তু দুধকে মন্থন করে মাখন করতে পারলে জলের সঙ্গে মেশে না, সে জলের ওপর ভাসে। তেমনি যাদের মন স্থির হয়েছে তারা যেখানে সেখানে বসে সর্বদা ভগবান্‌কে চিন্তা করতে পারে।'

রামকুমার বললেন, "মায়ের নাম জপ করবি তো দীক্ষা নে আগে। সাধনের বীজমন্ত্র চাই। তবে তো দেখবি নির্বিকার অখণ্ড আত্মার লীলাময়ী প্রকৃতির রূপ। তবে তো দেখবি জগন্ময়ী শ্যামা মাকে!"

গদাধরের মনে জেগে ওঠে আগ্রহ। বলে, "দীক্ষা দাও।"

"আমি দেব না! সহোদর তো। কেনারামের কাছে নিবি? স্বভাবসাধক। জ্ঞানী লোক।"

"নেব।"

কলকাতার বৈঠকখানা বাজারের কাছে থাকেন কেনারাম ভট্টাচার্য। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই আসেন। মন্দিরের চাতালে বসে জপ করেন। রামকুমার বলতেই রাজী হলেন।

চঞ্চল গদাধর আজ শান্ত সংযত।

কানে কানে বীজমন্ত্র দান করলেন গুরু। প্রাণ-মন্ত্র। প্রাণের তন্ত্রীতে তা ঝংকার তোলে। সে ঝংকারে আকুল গদাধর। "মা মা" বলে চেঁচিয়েই নিস্পন্দ, নিথর।

কেনারাম নির্বাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন গদাধরের দিকে।

রামকুমার ভীত চঞ্চল হয়ে ডাকলেন, "গদাই—গদাই—"

কেনারাম বললেন, "ডেকো না ভাই। ওর ভাব-সমাধি হয়েছে।"

পরম ভাব পরম যোগ। এতে কি বিঘ্ন ঘটাতে আছে?

শাক্তী-দীক্ষা নিয়েছে গদাধর। রামকুমার তাই তাকে শেখাতে লাগলেন শক্তিপূজার পদ্ধতি।

গদাধরের আগেই যেন সব জানা। কোনটাই দু'বার বলে

দিতে হয় না। রামকুমার অবাক্ হয়ে দেখেন। হৃদয়ও বেশ সুন্দর পুজো করতে পারে।

"যাক, দুঃখ ঘুচেছে আমার। বয়েস হয়েছে, ক'দিনই বা কাজ করতে পারব। ওরা ভার নিলে আমি নিশ্চিন্দি।"

"দেশ থেকে ঘুরে আসি কিছুদিনের জন্য। তুইও যাবি নাকি গদাই ?"

"না দাদা, তুমিই যাও। দু'জনে একসঙ্গে গেলে মন্দিরের কাজ চলবে কেমন করে ?"

মায়ের মন্দিরের ভার গদাধরকে আর রাধাগোবিন্দের ভার হৃদয়কে দিয়ে দেশে রওনা হলেন রামকুমার।

কিন্তু দেশে যাওয়া আর হল না। পথে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলেন বিশ্রাম করবার জন্য। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

খবর পেয়ে কত কাঁদল গদাধর। শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার কী কান্না !

মায়ের পুজোর ভার এবার সবটুকু গদাইয়ের উপরে। এতদিন দাদা ছিলেন, ভাবনা ছিল না। এখন !

"মা, তুই জানিস। আমি সাধন জানি না পূজন জানি না।"

নাই বা জানল। ক্ষতি কি ? হনুমানকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আজ কি তিথি ?' হনুমান বলল, 'আমি বার তিথি নক্ষত্র ওসব কিছু জানি না। আমি কেবল এক রাম পাদপদ্ম জানি।'

তন্ময় হয়ে পুজো করে গদাধর। সারাদিন ধরে চলে পুজো ভোগ-রাগ জপ ধ্যান আরতি।

সন্ধ্যারতির পর মাকে শয়ন দিলে সারাদিনের কাজ শেষ। তখন বেরিয়ে পড়ে মন্দির ছেড়ে। হৃদয়ও বেরিয়ে পড়ে। তারও ছুটি।

কিন্তু ঘরে ফিরে হৃদয় দেখে গদাধর নেই। ঘরে আসেনি। কোথায় গেল তবে!

সারা রাতেও ফেরে না গদাধর। ফেরে ভোরবেলায়! চোখ জবাফুলের মত লাল। পাগলের মত চেহারা।

হৃদয় শুধায়, "কোথায় ছিলে রাতভর?"

গদাধর বলে, "ঘুম আসে না তাই ছিলাম গঙ্গার ধারে। কী ঠাণ্ডা বাতাস ওখানে!"

"কিন্তু না ঘুমোলে শরীর যে ভেঙে পড়বে।"

গদাধর জবাব দেয় না। পাশ কাটিয়েচ লে যায়। হৃদয় মনে মনে ভাবে, বের করতে হবে এর রহস্য।

ঠাকুরবাড়ির উত্তর দিকের ঘরটায় থাকে গদাধর। পাশের ঘরে হৃদয়। ঘরের উত্তরে ফুলবাগান, নহবতখানা। আরও কিছুটা এগিয়ে গঙ্গার পারে পড়ো জমি, জঙ্গল। ওখানটা কবরডাঙা।

লোকে বলে ওখানটায় যেমন সাপের ভয় তেমনি ভূতের ভয়। ভুলেও কেউ ওদিকে যায় না।

সারারাত সেখানে কাটিয়ে ভোরবেলা সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল গদাধর।

"কি মামা, ফ্যাসাদ বাধাবে নাকি? ওখানে ঢোক, ভয় করে না তোমার?"

"ভয় কিরে, নিরালায় মায়ের নাম জপ করি।"

"কবরডাঙায় বসে জপ! কেন, মন্দিরে করতে পার না?"

"মন্দির তো একটু রাত হলেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমার এ মায়ের মন্দির বন্ধ হয় না দিনে রাতে কখনো।"

"কিন্তু ওখানে কেন!"

"নির্জনে না বসলে ধ্যান হয়?"

উত্তরকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন, 'ঈশ্বরচিন্তা লোকে

যত টের না পায় ততই ভাল।···গাছ যখন ছোট থাকে তখন তাকে যত্ন করে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, তা না হলে গরু ছাগলে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। পরে যখন গুঁড়ি মোটা হয় তাতে দশটা গরু ছাগল বাঁধলেও কিছুই করতে পারে না।'

মন্দিরে পুজোয় বসে আবার তন্ময় গদাধর।

রাধাগোবিন্দের মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, ভবতারিণীর মন্দির খোলা তখনও। গদাধর কি করছে এতক্ষণ। হৃদয় চুপি চুপি গিয়ে বসে ভবতারিণীর মন্দিরের কাছে।

ওকি! গদাধর করছে কি? মায়ের হাত টিপে দেখছে, গা টিপে দেখছে। চোখের ওপর দেখছে আঙুল নেড়ে।

"ওকি করছ মামা?"

"দেখছি।"

পাগল নাকি! পাথরের প্রতিমায় প্রাণ আছে কিনা তাই দেখছে!

তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে শয়ন দিয়ে ছুটে চলে গেল গদাধর। ডাকল না হৃদয়কে। হৃদয় তবু চলল পেছনে পেছনে।

ততক্ষণে সটান জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেছে গদাধর। আমলকী গাছতলায় বসে গেছে ধ্যানে। কিন্তু এদিকে হৃদয় খুঁজে খুঁজে হয়রান। গা ছমছম করছে তার। ভূত প্রেত সাপ···

"মামা গো, মামা—"

সাড়া পাওয়া যায় না। অন্ধকারে চোখে দেখা যায় না কিছু। ঘুরছেই শুধু হৃদয়।

চাঁদ উঠল বুঝি আকাশে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঢুকল আবছা চাঁদের আলো।

ঐ তো গাছের তলায় বসে আছে মামা। নিস্পন্দ নিথর। খুলে পড়ে আছে পরনের কাপড়, গলার পৈতে।

"মামা, মামা গো।"

সাড়া নেই।

"মামা!"

"কেরে, হৃদে!"

"একি করেছ তুমি। পরনের কাপড় খুলে ফেলেছ, গলার পৈতে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।"

"মাকে ডাকছি যে।"

"মাকে ডাকছো ডাকো। কিন্তু এ আবার কোন্ ঢং?"

"তুই এসব কি বুঝিস? মাকে পেতে হলে পাশমুক্ত হতে হয়। অষ্টপাশ। ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাত, দম্ভ। এ সব ছাড়তে হয়।"

"আমি এসব বুঝি না মামা। রাত জেগে জেগে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"তুই বুঝবি না। এসব হচ্ছে ছেলের মুখে চুষিকাঠি। চুষিকাঠি ফেলে দিয়ে ছেলে যখন কাঁদে তখনই তো মা আসে। নইলে কি মা আসে?"

"ঘরে চলো মামা।"

"না, তুই যা।"

হৃদয় ফিরে যায়। আবার ধ্যানস্থ হয় গদাধর।

"মা গো! আমাকে দেখা দে! রামপ্রসাদকে তুই দেখা দিয়েছিস, আমাকে তবে দিবি না কেন! কি দোষ করেছি আমি?"

কাঁদে গদাধর। চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

"মামা! তুমি কি পাগল হলে?"

"পাগল। না, পাগল হতে পারলাম কই? আমি তো বলি—মা আমায় পাগল করে দে। আমায় দে মা পাগল করে।"

হৃদয় ভাবে মামার পাগল হতে আর বাকী কোথায়?

পূজকের চালচলন ভাব-স্বভাব মন্দিরের গোমস্তাদের ভাল লাগে না। প্রতিমার সামনে বসে কাঁদে। কেমন ঢং করে! এ কেমন পুজো!

তারা কানাঘুষা করে। ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে।

কোন দিকে খেয়াল নেই গদাধরের। বন জঙ্গল মন্দির সবই এখন তার কাছে সমান।

"মা, মা গো! দেখা দিবি না? আসবি না তুই ছেলের কাছে?"

নাঃ! মা পাষাণী। পাষাণে গড়া তার দেহ, তার প্রাণ।

ছুটে চলে যায় আবার জঙ্গলে।

রাত শেষে ফিরে আসে ঘরে। পা টলছে মাতালের মত, চোখ টকটকে লাল। যেন আধ-পাগল।

হৃদয় তাকে দেখে চমকে ওঠে। বলে, "মামা, তোমার একি চেহারা!"

গদাধর জিজ্ঞেস করে, "মন্দির খোলেনি?"

"না, এখনই খুলবে। তুমি বসো, ঠাণ্ডা হও, চান কর।"

"না, বসব না, চান করব না, যতক্ষণ না মায়ের দেখা পাই। পাবো না কি?"

ছুটে চলে যায় গদাধর। ততক্ষণে মন্দির খুলেছে।

হৃদয়ও ছোটে পেছনে। "বাসী মুখে বাসী কাপড়ে চললে কোথায় মামা?"

"আমি আর সইতে পারছি না হৃদে, আমি আর সইতে পারছি না। আমার প্রাণ যেন মুচড়ে যাচ্ছে।"

প্রতিমার পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল গদাধর। "রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি তুই। আমাকে কেন দেখা দিবি না? আমিও তো তোর ছেলে।"

"মামা! মামা গো!" হৃদয়ের চিৎকারে ছুটে আসে মালী গোমস্তা চৌকিদার ও আরও অনেকে।

"একি পাগলের কাণ্ড! ধর না মুখুজ্যে! প্রতিমা উলটে পড়ে যাবে যে।"

হতভম্ব হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে হৃদয়। বাসী কাপড়ে মন্দিরে ঢুকতে সাহস পায় না। সংস্কারে বাধে!

মন্দির-প্রাঙ্গণে ভিড় জমে যায়। কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য নেই গদাধরের। হুঁশ নেই কোন।

"দেখা দিবি না? বেশ চাই না দেখতে। রাক্ষসী তুই। তাই তো রক্ত খেয়ে মুণ্ডমালা গলায় পরে নাচিস। আরো খাবি রক্ত?—"

মন্দিরের দেওয়ালে ঝুলছিল বলির খাঁড়া। সেদিকে নজর পড়ল। ছুটে গিয়ে নিয়ে এল সেই খাঁড়াটি। তারপর নিজের গলা কাটবার জন্য তুলে ধরল।

"একি করছে পাগলা পূজারী! একি করছে! ধরো ধরো—"

কিন্তু কেউ ধরতে পারে না। এগোতে পারে না কেউ। সবাই অচল অবশ অচেতন!

"রক্ত খাবি? নে আরও একটি মুণ্ড নে......একি.. একি...মা! মা! তুই!—"

প্রতিমার পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল গদাধর। নিস্পন্দ নিথর। মায়ের কোলে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে দুরন্ত ছেলে।

ধরাধরি করে অচেতন গদাধরকে তুলে আনা হল তার ঘরে। সারাদিন জ্ঞান হল না। পরের দিনও নয়। সময় সময় একটু জ্ঞান হয়...কি যেন প্রলাপ বকে...আবার জ্ঞান হারায়!

মথুরবাবু দেখতে এলেন। ডেকে আনলেন কবরেজকে। খবর পেয়ে বিকেলে এলেন রানী রাসমণি।

রানী শিয়রে বসলেন হাতে পাখা নিয়ে। মুখে চিন্তার রেখা। আহা, কি হবে বাছাধনের!

জ্ঞান হলেও গদাধরের ভাবাবেশ কাটে না। ঘুমের আবেশেই বলে—"মা এলি? এলি মা? মাগো!"

উথলে ওঠে রাসমণির মাতৃস্নেহ। অচেতন গদাধরের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে বলেন, "এই যে বাবা আমি।"

গদাধর চোখ মেলে তাকায়। দেখে রানী রাসমণিকে। প্রকৃতিময়ী মাতৃমূর্তি!

নয়

"দেখা দিয়েছিস যদি মা, ভাল করে দেখা দে। একটু থেকে পালিয়ে গেলে চলবে না। দাঁড়াতে হবে আমার কাছে, থাকতে হবে। তোকে নয়ন ভরে দেখব। বার বার দেখব। শিশু যেমন করে মাকে দেখে তেমনি করে দেখব।"

নিদ্রায় জাগরণে সব সময় এক ভাব।

হৃদয় ভাবে, মামার শক্ত ব্যামো হয়েছে। কবরেজ ওষুধ দিচ্ছে কিন্তু ওষুধে কোন ফল হচ্ছে না তো! কবরেজও রোগ ধরতে পারে না! কি করে বা ধরবে? এ যে ভাব-রোগ!

তাই তো ঠাকুর এক সময় বলেছিলেন, "হ্যাঁ শিবনাথ! তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বল যে ঐ সময়ে অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকা-কড়ি এই সব জড় জিনিসগুলোতে দিন রাত মন রেখে ঠিক থাকলে। আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ সংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে তাঁকে দিনরাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম। এ কোন্ দিশি বুদ্ধি তোমার?"

"মামা! মামা!"

"কি রে হৃদে!"

"এত রাতে বাইরে দাঁড়িয়ে করছ কি?"

"চুপ। শুন্‌চিস না শব্দ?"

"আমি যে দেখলাম ঝমঝম করে পাঁয়জোর বাজিয়ে কে

উঠল মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে! আমি যে স্পষ্ট দেখলাম, মা মহামায়া মুক্ত কেশে মন্দিরের দোতলার বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।"

হৃদয় অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে। কই, সে কিছু দেখছে না তো! মামা কি একেবারেই পাগল হয়ে গেল নাকি!

"অমন করে তাকিয়ে দেখছিস কি? আলাদা নজর দিয়ে দেখতে হয়। মন থাকলে চোখ বুজেও দেখতে পাওয়া যায় মাকে।"

পুজোয় বসেছে গদাধর! প্রতিমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে গিয়ে ফুলবেলপাতা নিজের মাথায় দিয়ে বসল। হেসে উঠল হিঃ হিঃ করে।

মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখল গদাধর। মূর্তি কোথায়? সশরীরে মা বসে আছেন। মন্দিরের সাজানো ভোগ খাচ্ছেন বসে বসে।

একদিন দেরি হয়ে গেল পুজো করতে। মা নৈবেদ্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

"কিরে, তর্ সইছে না? দাঁড়া, আগে মন্ত্রটা বলি।"

হৃদয় এসে দাঁড়ায় মামার গলা শুনে। দেখে, এ কি কাণ্ড করছে গদাধর!

ভোগের থালা থেকে এক মুঠো অন্ন তুলে ধরেছে প্রতিমার মুখের সামনে। বলছে, "নে, নে খা! খিদে পেয়েছে বুঝি খুব?"

প্রতিমার মুখ খোলে না। গদাধর তখন বলে, "কিরে, আমি না খেলে খাবি না বুঝি? আচ্ছা বেশ, আমি খাচ্ছি।"

হাতের খানিকটা অন্ন নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিলে গদাধর। তারপর সেই এঁটো ভাত প্রতিমার মুখে দিয়ে দিলে।

হৃদয় ভয়ে চীৎকার করে উঠল, "মামা, একি করছ? গোমস্তারা দেখতে পেলে কি হবে?"

কিন্তু হৃদয়ের কোন কথাই কানে যায় না গদাধরের। সে আপন

মনে তার কাজ করে যায়। প্রতিমার হাত ধরে নাচে। প্রাণ খুলে গান করে, "ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন"···

হৃদয় তাড়াতাড়ি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু যে আশঙ্কা সে করছিল, সে আশঙ্কাই তার সত্য হয়। দেখে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চৌকিদার ও গোমস্তারা। সবার মুখেই রাগ আর ভয়।

হৃদয়কে দেখেই গোমস্তারা বলল, "মুখুজ্যে, বেশ ব্যাপার চলছে। এমন ছেলেখেলা আর কতদিন চলবে? ছিঃ ছিঃ, একি অনাচার!"

হৃদয় কোন জবাব দিতে পারে না। সদরে নালিশ করবে এই ভয় দেখিয়ে চলে যায় গোমস্তারা।

হৃদয় মন্দিরে গিয়ে ডাকে গদাধরকে "মামা, বেলা তো হলো, এবার চলো। খাবে না?"

গদাধর বলে, "খেলাম তো। তুই খেগে যা। আমি এখন শোব।"

মন্দিরের এক পাশে মা কালীর শয্যা। ছোট রুপোর খাটে বিছানা পাতা। তাতেই পা গুটিয়ে ছোট্টটি হয়ে শুয়ে পড়ে গদাধর।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় বসে গদাধর হুঁকোতে তামাক খাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ভুড়ুক-ভুড়ুক। হৃদয়ও খাচ্ছে পাশে বসে। চারিদিকে ফুটফুটে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না।

হৃদয় বলল, "মামা, একটু বুঝে শুনে চলো। এদিকে সবাই যে যা তা বলছে।"

গদাধর বলল, "বলুক না, তাতে কি হবে।"

"এরপর মার খেতে হবে যে। সবাই তোড়জোড় করছে মেজবাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করবে।"

গদাধর নির্বিকার। তামাক টানতে টানতে বলে, "করুক গে।"

উঠে পড়ে গদাধর হুঁকোটা রেখে। হৃদয় বলে, আবার যাচ্ছ কোথায় এই রাত্তিরে? কবরেজ তোমাকে বেশী রাত জাগতে বারণ করেছে না?"

কার কথা কে শোনে? চলে যায় জঙ্গলের দিকে।

হৃদয় ভাবে, এ পাগলামি কি সারবে?

মন্দিরে একদিন ভোগ নিবেদন করছে গদাধর, একটা বেড়াল এসে উপস্থিত। ঘুরছে আর মিউমিউ করছে। গদাধর বলল, "মা এসেছিস? খিদে পেয়েছে? খাবি?"-

গদাধর ভোগের অন্ন বেড়ালকে খাওয়াতে লাগল।

এ পাগলামি! ঘোর পাগলামি! কথাটা জানাজানি হতেই চারদিকে নানা রকম ফুসফাস চলতে থাকে।

একদিন জঙ্গল থেকে ফিরে গদাধর বলে, "আজ কি হয়েছিল, জানিস হৃদে?

"কি হয়েছিল!"

"হাত পা তো জ্বলছেই আজ কদিন থেকে। আজ খুব বেশী জ্বলছিল। দেখি ভঁস ভঁস করে কালো মেঘের মত কে একটা বেরিয়ে এল এটার ভেতর থেকে।" বলে গদাই নিজের বুকে আঙুল ঠুকে দেখাল।

"বল কি?" অবাক্ হৃদয়।

"একা নয়। পেছনে আরও একটা। ফরসা, সুন্দর, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল। সন্ন্যাসী। কালো মূর্তিটা খুব তড়পাচ্ছিল। সন্ন্যাসী ওর বুকে ত্রিশূল বসিয়ে দিল। ওটা মরে কালো ধোঁয়ার মত পাক খেতে খেতে মিলিয়ে গেল আকাশে।"

হৃদয় হাসতে লাগল কথা শুনে। "তারপর কি হল মামা?"

"তখন সন্ন্যাসী বলল, 'দেখলি তো মরে গেল। যেমন আছিস থাক। মাকে যেমন ডাকছিস ডাক। কারও কথায় নাচবি তো এমনি



ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ

ত্রিশূল বিঁধিয়ে মারব।' বলে ঢুকে গেল এই খোলটায়!"

হৃদয় বলে, "মামা, তুমি স্বপ্ন দেখেছ।"

"স্বপ্ন? না রে, আমি যে নিজের চোখে দেখলুম। কি জানি, ভাবতে ভাবতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তবে কি জানিস আমার গায়ের জ্বালাটা কিন্তু আর নেই। ওই পাপটাই বুঝি জ্বলছিল ভেতরে থেকে।"

মামা, তুমি কিছুদিন বিশ্রাম নাও। কবরেজের বিধান একটু মেনে চলো।"

"না। ঐ আমলকী গাছটা পড়ে গিয়ে বড্ড অসুবিধা হয়েছে। আমার বসবার জায়গা নেই। ওখানে পঞ্চবটী করব।"

গদাধর নিজেই অশথের চারা লাগাল। হৃদয় নিয়ে এল বট, অশোক, বেল আর আমলকী গাছ। তুলসী আর অপরাজিতার চারাও পোঁতা হল। কিছুদিনের মধ্যেই ঝোপঝাড়ে ভরে উঠল জায়গাটি।

খাসা জায়গা! ভিতরে ধ্যানে বসলে কেউ দেখতে পায় না।

চুপচাপ সেখানে বসে আছে গদাধর। হঠাৎ জায়গাটা আলোতে ভরে উঠল। কি হল! গদাধব তাকিয়ে দেখল এক অপূর্ব সুন্দরী নারী এগিয়ে আসছে তার দিকে।

'কে? কে মা তুমি!' ব্যাকুল আকুতি ফুটে উঠল গদাধরের চোখে মুখে। এমন সময় 'হুপ' 'হুপ' শব্দ করে সেখানে লাফিয়ে পড়ল এক হনুমান।

চিনতে বাকী রইল না—জনকনন্দিনী সীতা এসেছেন। 'মা' 'মা' বলে গদাধর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আর সেই মূর্তি যেন তার শরীরেই ঢুকে পড়ল।

সার্থক পঞ্চবটী। কিন্তু পঞ্চবটীর গাছ সব গরু ছাগলে খেয়ে ফেলে। তাই গদাধর একদিন বাগানের মালী হরিকে বলল, "জায়গাটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দে না একটু।"

হরি বলল, "কিন্তু বাঁশ দড়ি পেরেক অনেক চাই যে।"

"তাহলে থাক, ওসব আমি কোথায় পাবো!" নিঃশ্বাস ফেলে গদাধর তাকাল গঙ্গার দিকে।

ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে গঙ্গা। "বান! বান এলো গঙ্গায়।" চেঁচিয়ে উঠল হরি। "সরে আসুন বাবাঠাকুর, পালান।"

গদাধর নড়ল না। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে লাগল ফিকফিক করে। নব বর্ষা দেখে শিশুদের যেমন আনন্দ!

বান চলে গেল। মন্দিরে ঘাটের কাছে পড়ে রইল এক বোঝা কাঠ বাঁশ দড়ি পেরেক।

বাগানের মালী হরি ছুটে গিয়ে টেনে আনল। চেঁচিয়ে বলল, "সবই পাওয়া গেল ঠাকুর। মা গঙ্গাই দিয়ে গেলেন। খাসা বেড়া হবে।"

"হৃদে! হৃদে! দেখে যা, মা গঙ্গা দিয়ে গেলেন।"

হৃদয় ছুটে এসে সব দেখে অবাক্। তার মুখে কথা সরে না।

খাজাঞ্চীর ঘরে গিয়ে ভাঁড়ারী বলল, "দেখেছেন?"

খাজাঞ্চী জিজ্ঞেস করলেন, "কি?"

"সেই যে আমলকী গাছটা ছিল, তার নীচে আসন করা হয়েছে। খানিকটা জায়গা জুড়ে বেড়াও দেওয়া হয়েছে বেশ করে।"

"বল কি? এ যে জমি দখলের মতলব।"

"তাইতো। এবার আখড়া হবে, বোষ্টমী আসবে। ব্যস, মৌরুসী স্বত্ব। এরপর আর ওঠাবে কে?"

"দাঁড়াও, খবর পাঠাচ্ছি সদরে। জায়গা দখল করার মজা বের হবে এবার।"

সঙ্গে সঙ্গে নালিশ চলে গেল রানী রাসমণির দরবারে। কয়েক দিন পরেই খবর এল রানীমা নিজেই আসছেন সরেজমিনে তদন্ত করতে।

গদাধর গঙ্গার ঘাটে বসে আছে। সেই ঘাটে স্নান করতে এসে ভাঁড়ারী বলল, "শুনছেন ?"

গদাধর বলল, "কি ?"

ভাঁড়ারী বলল, "রানীমা নিজেই আসছেন তদারক করতে।"

"বেশ ভালই তো, দেখাশোনা হবে।" বলে হাসতে লাগল গদাধর।

ভাঁড়ারীর গায়ে জ্বালা ধরল ফোড়ন কেটে বলল, "দেঁতো হাসি দেখলাম, এরপর দাঁতকপাটিও দেখবো।"

হৃদয় আসতেই গদাধর জিজ্ঞেস করল, "দাঁতকপাটি কিরে ?"

"কিসের দাঁতকপাটি ?"

"ঐ যে ভাঁড়ারী বলল, 'দেঁতো হাসি দেখলাম, এরপর দাঁত-কপাটিও দেখবো'।"

"তাই বলেছে নাকি ?" আঁতকে উঠল হৃদয়। "যে ভয় করছিলাম, তাই হয়েছে মামা। নিশ্চয়ই নালিশ গেছে সদরে।"

দক্ষিণেশ্বরে এলেন রানী রাসমণি। সারাদিন তদন্ত করলেন। গোমস্তারা অনেক নালিশ করল পূজক গদাধরের নামে। আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। সবার কথাই শুনলেন। শুনলেন বাগানের মালী হরির কথাও। সেই ভেসে আসা কাঠ, বাঁশ, দড়ি, পেরেকের কথা।

বিকেলবেলা মন্দিরে পুজোর আয়োজন করতে বসেছে গদাধর! কে এসে খবর দিল, রানীমা আসছেন রেগে মেগে।

গদাধর মাথা তুলে তাকাল একটু। রানীমা আসছেন রেগে মেগে ? কেন !

মন্দিরে এলেন রাসমণি। সঙ্গে মথুরামোহন ও হরি। এসে দেখেন পূজারীর আসনে গদাধর নেই।

"কোথায় গেলেন ছোট ভট্‌চায ? খুঁজে দেখো, পুজোর আয়োজন ফেলে কোথায় গেলেন ?"

"ঐ তো", মথুরামোহন বললেন। প্রতিমার পেছনে মায়ের বেনারসী শাড়ীর আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে আছে গদাধর। ভয়মাখা চোখ মুখ। যেন মা যশোদার আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে আছে নন্দকিশোর !

"ওকি ! তুমি ওখানে কেন বাবা ?" বলতে বলতে মন্দিরে ঢুকলেন রাসমণি।

এক হাতে শাড়ীর আঁচলটা চোখে মুখে চাপা দিয়ে আর এক হাতে প্রতিমার পা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল গদাধর। বলল, "মা, ঐতো তেড়ে আসছে আমাকে তাড়াবে বলে। তুই বলে দে না মা, তুই বলে দে—"

রাসমণি ব্যাপার দেখে বিস্মিত, বিমুগ্ধ। কোন কথা সহসা বের হল না মুখ দিয়ে। তারপর বললেন, "কে তাড়াবে তোমাকে বাবা ? কে তাড়াবে !"

গদাধর তবু বের হয় না আঁচলের আড়াল থেকে।

মমতায় ভরে ওঠে রাসমণির অন্তর। "বোকা ছেলে, মায়ের বৈকালী দেওয়া হয়নি যে।"

"ওঃ, তাই তো !" যেন কিছুই হয়নি। শান্ত শিষ্ট ছেলের মত পুজোর আসনে এসে বসল গদাধর। হেসে চলে গেলেন রাসমণি।

কুঠিঘরে বসল রানীর দরবার। ভাঁড়ারীর চাকরি গেল, খাজাঞ্চীকে বদলী করা হল। গোমস্তাদের অনেকেরই সাজা হল কম-বেশী।

রাসমণি বললেন, "কিছু শুনতে চাই না আর। শুনেছি, বুঝেছি

সব। ছোট ভট্‌চাযকে তাড়াবার কথা ভাববো আমি। দরকার হলে আমিই তাড়াবো।"

রাসমণি উঠে যাচ্ছিলেন, এসে হাজির হল গদাধর। বলল, "মা, মায়ের দোরে মাথা খুঁড়ে কাঁদছে ভাঁড়ারী।"

"চাকরি গেছে কাঁদবে না! তুমি বসো বাবা।"

"আহা বেচারী, ছাপোষা মানুষ। মায়েরই তো ছেলে।"

রাসমণি বুঝলেন গদাধরের মনের কথা। বললেন, "মথুর, বলে দাও। ভাঁড়ারী থাক। খাজাঞ্চীও থাক। যে যেমন ছিল তেমনি থাক। মায়ের বাড়িতে যা করতে হয় মা-ই করবেন।"

সেদিন দক্ষিণেশ্বরেই রইলেন রাসমণি। পরদিন বিকেলে জানবাজারে ফিরে যাবেন। বিষয়কর্মের ঝামেলা ছেড়ে থাকাও যায় না। দুপুরবেলা পুজোর পর রাসমণি এলেন মন্দিরে। বললেন, "একটু মায়ের নাম শোনাও বাবা।"

গদাধর গান ধরল। চোখ বুজে শুনতে লাগলেন রানী।

হঠাৎ বলা-কওয়া নেই গদাধর রানীর গালে এক চড় বসিয়ে দিল। ধমকে উঠে বলল, "এখানেও ঐ ভাবনা?"

চারদিক থেকে হইহই করে উঠল রানীর দাসীরা, খাজাঞ্চী গোমস্তারা। হৃদয় ছুটে এসে বলল, "মামা, তুমি একি করলে? রানীমার গায়ে হাত তুললে যে!"

গদাধর বলল, "আমি কি করব! মা যা করান আমিও তাই করি।"

খবর পেয়ে এলেন মথুরামোহন। নাঃ, আর সহ্য করা যায় না! এবার পূজকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু রানী বসলেন বেঁকে। বললেন, "ছোট ভট্‌চায ঠিকই করেছে। দোষ আমারই। মায়ের মন্দিরে বসেও হাইকোর্টের মামলাটার কথা ভাবছিলাম। ওর হাত দিয়ে মা শাসন করেছেন আমাকে।"

কী আশ্চর্য !

ঠাকুর তাই পরবর্তী কালে বলেছিলেন, "বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ভগবান লাভ হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকতে তাঁকে পাওয়া যায় না। বিবেক-বৈরাগ্য এলে তবে মন পবিত্র হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, তবে না ভগবান্ কৃপা করবেন। কেমন জান, একজন লোক তার ক্ষেতে জল ছেঁচছে। সমস্ত দিন জল ছেঁচে সন্ধ্যার সময় মনে করলে একবার দেখি কতটা জমি ভিজল। এসে দেখে একটা আলের মধ্যে একটা গর্ত দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে, এক ছটাক জমিও ভেজেনি। বিষয়বুদ্ধি থাকলে সেই রকম তাঁর নাম দিন রাত করলেও কিছুই হয় না।"

আত্মহারা উন্মাদ ভাব গদাধরের।

ওর কাঁধে কি চাপল কে জানে? গাছের ডালে বসে থাকে। হি হি করে হাসে। বুনো ফল আস্ত কামড়ে খায়। পরনের ধুতিটা পাকিয়ে কোমরে লেজ এঁটে হাঁক ছাড়ে, রঘুবীর! রঘুবীর!

মানুষ আবার হনুমান হয় নাকি! এ যে হনুমানের মতই ভাব।

মথুরামোহন এলেন জানবাজার থেকে খবর পেয়ে। হৃদয় বলল, "মামাকে নিয়ে একবার দেশ থেকে ঘুরে আসি। মায়ের ছেলে মায়ের কাছে কিছুদিন থাকুক। দেখি, তাতে যদি পাগলামিটা সারে।"

মথুরামোহন ভাবলেন, মন্দ হয় না। কিন্তু যোগ্য পূজকের হাতে পুজোর ভার দিতে হবে তো?

ঠিক সেদিনই ধুলো পায়ে এক লম্বা-চওড়া চেহারার ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন কুঠিবাড়ির দোরগোড়ায়!

"গদাধর এখানকার পূজারী না!"

"আসুন, কি চাই আপনার?"

"আমার নাম রামতারক চাটুজ্জে। গদাধর আমার জেঠতুতো ভাই। অনেক দিন দেখিনি তাকে। দেখতে এলুম। আর এলুম, যদি এখানে কোন কাজ পাই।"

মথুরামোহন ভাবলেন, মা-ই মিলিয়ে দিলেন এঁকে। বললেন, "কালী-মন্দিরের পুজোর ভার নিতে পারেন আপনি?"

রামতারক শাক্ত নন, তান্ত্রিকও নন। বৈষ্ণব। তবু পেশার খাতিরে সব কিছু করতে রাজী। কিন্তু মনে সন্দেহ। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "গদাধরই তো এখানকার পূজারী শুনেছি।"

মথুরামোহন বললেন, "ওর অসুখ, বায়ুরোগ। কবরেজী চিকিৎসা-তেও ফল হচ্ছে না। তাই ভাবছি, ওকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দেব।"

ঠিক সেই সময়েই দিগম্বর গদাধর সেই পথ দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। কাঁধে একটা বাঁশের লাঠি, পরনের ধুতিটা পাকিয়ে কোমরে লেজের মত বাঁধা।

"ও কে, গদাধর না?"

"হ্যাঁ, দেখুন। ঐ তো অবস্থা।"

"ভাববেন না কিছু। ছোটবেলা থেকে সাধন ভজনে মেতে গেলে এমনই একটা ধাক্কা আসে যৌবনে। ঘর-সংসারে মন বসলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"যা হোক, আপনি ভবতারিণীর পুজোর ভার নিন। গদাধর থাক তার পাগলামি নিয়ে।"

কিন্তু হোক পাগল, তবু তার অনুমতি নেওয়া তো দরকার। তাই মথুরামোহন বললেন গদাধরকে, "তোমার দাদা রামতারক চাটুজ্জেকে পূজক করলে কেমন হয়?"

গদাধর বলল, "কে, হলধারী?"

রামতারক গদাধরের চেয়ে বয়সে বড়। তাঁকে সে হলধারী দাদা বলেই ডাকে।

"হলধারী বৈষ্ণব। তা হোক। যে কালী সেই কৃষ্ণ। যে শ্যাম সেই শ্যামা। বেশ তো, রাখো তাঁকে।"

সেই থেকে হলধারী মা কালীর পূজক নিযুক্ত হলেন। ভবতারিণীর মন্দিরে হলধারী আর বিষ্ণুর মন্দিরে হৃদয়। গদাধরের ছুটি।

মথুরামোহন ভেবেছিলেন গদাধরের পাগলামি কমবে। কই, কমছে না তো!

একদিন এক হাতে মাটি আর এক হাতে টাকা নিয়ে গঙ্গাতীরে বসল গদাধর। কোন্‌টা ভারী! কোন্‌টার বেশী দাম! মাটি না টাকা? টাকা না মাটি?

ভাবতে ভাবতে মনে হল দু'টিই সমান, দু'টিই অসার। মাটি আর টাকা দুটোই ছুড়ে ফেলে দিল গঙ্গায়।

মুক্ত হয়ে গেল বুঝি মন।

কিন্তু তাতেই কী মন একেবারে মুক্ত হয়! কত অভিমান, কত অহংকার তো মনকে ছেয়ে আছে। কাঙালীরা খেয়ে গেছে, মাথায় করে তাদের এঁটো পাতা ফেলে নিজে ঝাঁটা দিয়ে জায়গা পরিষ্কার করতে লাগল গদাধর। মেথরের কাজ করল স্বচ্ছন্দ ভাবে।

মথুরামোহনের এসব পছন্দ নয়। তাই একদিন বললেন গদাধরকে, "দেখো, সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হয়। স্বয়ং ভগবান্‌ও নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলেন।"

গদাধর বলল, "তিনি তো নিয়মাতীত। তিনি আবার নিয়ম মানবেন কিগো?"

"তাঁরই বিধানে গাছে গাছে ফুল ফোটে। কোন গাছে সাদা, কোন গাছে লাল। তাই বলে তিনি কি বিধান ভাঙেন? সাদা ফুলের গাছে কি ফোটান লাল ফুল?"

"বিধির বিধানে সব কিছু হতে পারে।"

"না। প্রমাণ দেখাতে পারো তার ?"

"মাকে বলে দেখি।"

পরের দিন ভোরে ফুল তুলতে বেরিয়েছে গদাধর আর হৃদয়। জবা গাছে হাত দিতেই দেখে একই ডালে দু' বোঁটায় ফুটেছে দু'টি জবা— একটি সাদা আর একটি লাল।

সে পথ দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিলেন মথুরামোহন। গদাধর বলল, "এই দেখ সেজবাবু। এক গাছে দু'রকম ফুল ফোটে না বলেছিলে। এই তো ফুটেছে।"

মথুরামোহন নির্বাক্। গদাধর কি ভেলকিও জানে!

মথুরামোহন গদাধরকে ভাল ধুতি, জামা ও চটি কিনে দিলেন। গদাধরের দেখে খুব পছন্দ। কিন্তু পরে না কোনটাই।

মথুরামোহন বললেন একদিন, "চলো, শহরে বেড়াতে যাবো। ধুতি, জামা ও চটি পরে নাও।"

শহরে বেড়াতে যাবার নামে গদাধরের কী আনন্দ! ছেলে-মেয়েরা যেমন পুজোর প্রতিমা দেখার আগে জামাকাপড় পরে তেমনি হইহই করে জামা কাপড় পরল। হরিই পরিয়ে দিল।

জুড়িগাড়িতে চড়েও কী আনন্দ গদাধরের! মথুরামোহন পাশে বসলেন। কোচোয়ানের সঙ্গে হরি। শহরের ঝকঝকে আলোময় পথে গাড়ি পড়তেই আরও আনন্দ গদাধরের। ছোট ছেলের মত এটা দেখে ওটা দেখে।

মেছুয়াবাজারে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। বড় বাড়ি, ফটকে দরোয়ান। গদাধর জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছ গো ?"

মথুরামোহন বললেন, "এসো, গান শুনবে।"

বারান্দা পেরিয়ে ঢুকেই সাজানো হলঘর। ঘরে দামী আসবাব, মেঝেয় গালিচা পাতা।

লছমী বাঈজীর ঘর। মথুরামোহনের আগেই সব কিছু বলা ছিল। তৈরী হয়েই ছিল তারা। গদাধর গিয়ে বসতেই নাচ গান শুরু করল।

মথুরামোহন সরে গেলেন এক ফাঁকে। বাঈজীরা গায়ের কাপড় ফেলে গদাধরের কাছে গিয়ে বসল। নাচতে লাগল গা ঘেঁষে।

গদাধর মুগ্ধ। ভাবে মাতোয়ারা। নিজেও উঠে নাচতে লাগল বাঈজীদের সঙ্গে। মুখে বলতে লাগল, "আহা কী মধুর! তুমি রমা, তুমিই শ্যামা। তুমিই মা রণরঙ্গিণী।"

শিউরে উঠল বাঈজীরা। লোকটি বলছে কি? এমন সাধু লোককে তারা টেনে আনতে চায় পাপের পথে? ছিঃ ছিঃ!

চিৎকার করে তারা লুটিয়ে পড়ল গদাধরের পায়ের কাছে।

ছুটে এলেন মথুরামোহন! একি হল! তখনও মাতালের মত টলছে গদাধর। শুধু জামাটাই আছে গায়ে। ধুতি চাদর সব খুলে পড়েছে।

"হরি, হরি, এদিকে আয়!" হরিকে ডেকে মথুরামোহন গদাধরের গায়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন। দু'জনে ধরে ওঠালেন তাকে গাড়িতে।

তখনও গদাধর ভাবে বিভোর। বলল, "মা দেখতে বেরিয়েছিলাম। ঘর ভরতি মা দেখলাম আজ। বাঃ, বেশ দেখতে!"

মথুরামোহন কাঁপছেন তখন।

পরের দিন হরির কাছে সব কথাই শুনলেন রাসমণি। মথুরামোহনকে ডেকে বললেন, "ছিঃ ছিঃ, তুমি একি করেছ মথুর!"

মথুরামোহন লজ্জায় কয়েকদিন বের হলেন না বাড়ি থেকে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব। পুরীধাম থেকে ফেরবার পথে কামারপুকুর হয়ে এসেছেন। গদাধর শুধাল তাঁর কাছে, "কেমন আছে মা?"

"বড় কাহিল হয়ে পড়েছেন মা তোমার। বুড়ো হয়েছেন তো! তোমাকে-বার বার করে যেতে বলেছেন।"

সে কথা শোনার পর থেকে চঞ্চল হয়ে উঠল গদাধর। হৃদয়কে ডেকে বলল, "হৃদে, চল্।"

"কোথায়?"

"দেশে। মা যেতে বলেছে।"

"আমি যাব কি করে? পুজো রয়েছে যে।"

অবশ্য অসুবিধা হল না খুব। হৃদয়ের দাদা এলেন রামরতন মুখুজ্জে। হলধারী করছিলেন মা কালীর ঘরে পুজো। কিন্তু বৈষ্ণব মানুষ। বলির সময় মন খুঁত খুঁত করে। তাই হৃদয়ের সঙ্গে পালটা-পালটি করে নিয়েছিলেন। হৃদয় ছিল মা কালীর পূজারী আর হলধারী ছিলেন রাধাগোবিন্দের।

মথুরামোহন বললেন, "আপনি যান ছোট ভট্চাযের সঙ্গে। ওঁকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। যে পর্যন্ত না ফিরে আসেন, আপনার দাদাই করবেন মা কালীর পুজো।"

দশ

ছ'বছর বাদে কামারপুকুরে ফিরে এল গদাধর। চন্দ্রমণির বয়স হয়েছে ষাটের উপর। জীর্ণশীর্ণ শরীর। বড় ছেলের মৃত্যুর পর শরীর গেল আরও ভেঙে। বেঁচে রইলেন ছোট ছেলের মুখ চেয়ে।

কিন্তু একি বলে হৃদয়! গদাই নাকি পাগল! সবাই তাকে পাগল বলে! ন্যাংটো হয়ে গাছের ডালে বসে থাকে। পুজো-আচ্চা করে না, পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। বাবুরা কবরেজ বদ্যি অনেক দেখিয়েছেন। কোন ফল হয়নি।

চিন্তায় পড়লেন চন্দ্রমণি। কি হবে!

গদাই এসেছে শুনে গাঁয়ের লোকেরা ছুটে এল। ছুটে এল ছোটবেলার সাথী ছেলে ও মেয়েরা। গদাই তাদের দেখে ফিক ফিক করে হাসল। মাথায় চাঁটি মারল ছোটদের। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকল, "মা, মা!"

কে বলবে, গদাধর এখন চব্বিশ বছরের যুবক। সে যেন সেই বারো বছরের ছেলে।

চন্দ্রমণির আনন্দ ধরে না।

ক'দিনের জন্য হৃদয় তার বাড়ি সিয়রে চলে গেল।

গদাধর একা।

ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, ভূতির খাল ধারে, নির্জন শ্মশানে। চিরপরিচিত জায়গায় এসে গদাধর যেন আবার সেই কিশোর বালকটি।

বাড়ি থেকে বেরুবার আর ফেরবার কোন সময় বাঁধা নেই। রাত হয়ে যায় তবু বাড়ি ফেরে না কোন দিন।

চন্দ্রমণি ঘর বার করতে থাকেন। মেজো ছেলে রামেশ্বরকে বলেন, "দেখে আয় না গদাই কোথায়!"

রামেশ্বর বলেন, "তোমার ছেলে সত্যি পাগল মা। শ্মশানে বসে জপ করে। শেয়াল কুকুর চলে যায় কোল ঘেঁষে, ওর গা চাটে, তবু ওর কোন হুঁশ নেই।"

"বলিস কি রে?" ভয়ে আঁতকে ওঠেন চন্দ্রমণি। "যা খুঁজে নিয়ে আয় ওকে। শেষে অপঘাতে মারা পড়বে।"

ওকে ভূতে পেয়েছে নিশ্চয়!

অনেক নাম-করা ওঝাকে খবর দিয়ে আনলেন চন্দ্রমণি। একজন নয়, পরপর কয়েকজন। ওঝারা এসে নাচল, বাজাল, জল পড়ে মাথায় ছিটাল, সলতে পুড়িয়ে দিল গদাধরকে শুঁকতে।

গদাধরকে সামনে দাঁড় করিয়ে চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগল। বলল—ফুঃ!

গদাধরও বলল—ফুঃ! হাসল ফিক ফিক করে।

'এসব হাতুড়ে ওঝার কর্ম নয়। শক্ত ভূত। চণ্ড নামাতে হবে। ওস্তাদ ওঝা আনতে হবে।'

এবার এল আরো পাকা তান্ত্রিক ওঝা! একসঙ্গে কয়েকজন। পুজো হল। যজ্ঞ হল। চণ্ডীপাঠ হল। তারপর সবাই চেঁচিয়ে ডাকল, "আয়, নেমে আয়।"

একগাল সুপুরি চিবোতে চিবোতে হাসছে গদাধর। "বেটাদের কাণ্ড দেখ!"

সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখছে। কি কাণ্ড এখন ঘটবে কে জানে। ওস্তাদ ওঝাদের ব্যাপার তো!

মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ওঝারা যজ্ঞের আগুনে ঘি ঢালতে ঢালতে বলল, "এলি ? নেমে আয়।"

ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই। হঠাৎ শব্দ হল সোঁ···সোঁ···

চণ্ড নামল। শোনা গেল খোনা গলায় কে যেন বলছে, "ছেড়ে দে। গদাইকে ভূতে পায়নি। ওর কোন আধিব্যাধি নেই। কেন কষ্ট দিচ্ছিস ওকে ?"

ওস্তাদ ওঝারা মাথা নোয়াল। গদাই হাসতে লাগল হিঃ হিঃ করে।

চণ্ড বলল, "ও গদাই, অত সুপুরি খেও না। ওতে কাম ভাব বাড়ে।"

আবার সোঁ সোঁ শব্দ······চলে গেল চণ্ড।

ওঝারাও চলে গেল। চন্দ্রমণি গদাধরের পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। মন তাঁর আজ অনেকটা চিন্তামুক্ত।

সেদিন থেকে গালভরা সুপুরি খাওয়া ছেড়ে দিল গদাধর।

পাড়াপড়শীরা এসে ধরল এবার। "বামুন মা, ছেলের এবার বিয়ে-থা দাও। দেখবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

চন্দ্রমণি সে কথা বললেন রামেশ্বরকে। রামেশ্বর বললেন, "গদাই রাজী হলে হয়।"

কিন্তু আশ্চর্য। গদাধর রাজী আছে। মেয়েও নাকি কুটো-বাঁধা হয়ে আছে জয়রামবাটীতে। রাম মুখুজ্যের মেয়ে।

সিয়রে হৃদয়দের বাড়িতে গিয়েছিল গদাধর। গানের আসর বসেছিল। কত ভিড়। একটি স্ত্রীলোকের কোলে ছিল ছোট একটি ফুটফুটে মেয়ে। টুল-টুল করে তাকিয়ে চারদিকে দেখছিল। স্ত্রীলোকটি রহস্য করে জিজ্ঞেস করল মেয়েটিকে, 'বিয়ে করবি ?' মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। 'কাকে বিয়ে করবি এত লোকের মধ্যে ?' মেয়েটি গদাধরকে দেখিয়ে বলল—'ঐ যে।'

স্ত্রীলোকটি সিয়রের হরিপ্রসাদ মজুমদারের মেয়ে শ্যামাসুন্দরী। জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কোলে তাঁরই সন্তান সারদা। এসেছে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে।

জয়রামবাটীতে লোক পাঠালেন চন্দ্রমণি। সেই লোক দেখে এসে বলল, "সব কিছু ভাল। কিন্তু মেয়ের বয়স মোটে পাঁচ।"

হোক পাঁচ। মেয়ে বড় হতে ক'দিন লাগে? চন্দ্রমণি মত দিলেন।

কন্যাপক্ষের পণ তিনশো টাকা। রামেশ্বর তাও যোগাড় করলেন। বিয়ের দিন ঠিক হল বোশেখ মাসের শেষ দিকে। সেটা বাংলা ১২৬৬ সাল।

জয়রামবাটীতে বিয়ে। বর যাবে, বরযাত্রীরা যাবে। হইহই ব্যাপার! সুন্দর ধুতি জামা, গলায় ফুলের মালা ও কপালে চন্দন দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে গদাধরকে। কিন্তু মেজ বৌদির মনে দুঃখ! বিয়েতে বাজনা নেই।

"বিয়ের চলন যাবে, বাজনা কোথায়? বাজনা ছাড়া চলন হয়?"

টাকা পয়সার অভাবে বাজনার ব্যবস্থা করতে পারেননি রামেশ্বর। কিন্তু মেয়েরা তা বোঝে না।

এয়োরা উলু দিলেন। শাঁখ বাজল। গদাধর মেজ বৌদির মনের দুঃখ ঘুচাবার জন্য বলল, "দাঁড়াও বৌঠান, আমিই ঢোল বাজাই।"

দু'হাতে পাছা বাজিয়ে নাচতে লাগল গদাধর। মুখে বোল তুলল ঢোলের। রঙ্গ দেখে মেয়েরা হেসে লুটোপুটি। মেজ বৌদির মনে আর দুঃখ রইল না। হাসতে হাসতে ছুটে এসে বললেন, "থামো গো থামো। পালকিতে ওঠো তুমি।"

কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী মাইল চারেক পথ। সন্ধ্যার আগেই পালকি পৌঁছে গেল জয়রামবাটীতে।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে।

টুকটুকে রাঙা বউ নিয়ে ঘরে ফিরল গদাধর। ছোট্ট মেয়ে সারদা। তাই সঙ্গে এল তার কাকা।

নতুন বউকে দেখবার জন্য কামারপুকুরের বাড়িতে কী ভিড়! চন্দ্রমণির মনেও কী আনন্দ!

কিন্তু রাত্রি বেলায় মনটা খচখচ করতে লাগল। বউয়ের গা ভরতি গয়না। একটাও নিজেদের নয়। গয়না গড়িয়ে দেবার সংগতি নেই, তাই লাহাদের বাড়ি থেকে চেয়ে এনে সাজানো হয়েছে বউকে। আজ ফেরত দেবার কথা।

"আহাহা, কোন্ প্রাণে ঐ কচি গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নেব?"

মায়ের মনের কথাটা বুঝতে পারল গদাধর। বলল, "তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা। আমি খুলে নিতে পারব।"

সারদা ঘুমিয়ে পড়ল। গদাধর আলগোছে খুলে নিল তার গা থেকে সবগুলো গয়না।

সকালে উঠে সারদা অবাক্। চন্দ্রমণিকে জিজ্ঞেস করল, "মা, আমার গয়না কই?"

চন্দ্রমণির বুক ফেটে গেল দুঃখে। সারদাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "মা, গদাধর এর চেয়েও ভাল গয়না তোমাকে এনে দেবে।"

সারদা শান্ত হল বটে, কিন্তু তার খুড়ো নিরাভরণা ভাইঝিকে দেখে রেগে গেলেন। এ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি! কোন ওজর আপত্তি না শুনে সারদাকে নিয়ে সেদিনই জয়রামবাটীতে চলে গেলেন।

কামারপুকুরে কয়েকদিন থেকে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে চলে গেল। গদাইকে ছাড়লেন না চন্দ্রমণি। বললেন, "আরও কয়েকটা দিন থেকে যা। শরীরটা ভাল করে সারুক।"

প্রায় দু'বছর কামারপুকুরে থাকার পর গদাধর ফিরল দক্ষিণেশ্বরে।



ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

খবর পেয়ে দেখতে এলেন মথুরামোহন। ভেবেছেন, বে-থা করে ছোট ভট্চায বদলে গেছেন।

এসে প্রণাম করতেই বালকের মত গদাধর জড়িয়ে ধরল মথুরামোহনকে। "ভাল আছ তো সেজবাবু!"

গদাধরের স্পর্শে মথুরামোহনের সারা অঙ্গে যেন বিদ্যুতের শিহরন খেলে গেল।

একি! এ কে! নির্বাক্ অভিভূত মথুরামোহন।

মা কালীর পুজোর ভার আবার পড়ল গদাধরের উপর। পুজোর উপর তার যত্ন যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে তার জপ-সাধনার একাগ্রতা।

মন্দির নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তবু মায়ের কাছ ছেড়ে ওঠে না গদাধর। মন্ত্র ভুলে জপধ্যান ভুলে সকাতরে ডাকতে থাকে, "মাগো, দেখা দে মা, দেখা দে।" গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে হৃদয়। বলে, "মামা, আবার একি শুরু করলে? তুমিই তো বল মাকে দেখেছ, তবে আবার খেপামো কেন?"

গদাধর বলে, "এই দেখি, এই নেই। দেখি প্রতিমার বুক দোলে, চোখে পলক পড়ে। আমি ধরতে গেলেই চুপ হয়ে যায়।"

হৃদয় বলে, "ওসব কি বলছ? পাথরেরই গড়া তো প্রতিমা।"

"তাতে কি হয়েছে? জল কাদা ধুলো মাটি আর পাথর দিয়ে গড়া তো পৃথিবী। তবু সারা পৃথিবী জুড়ে প্রাণের প্রবাহ।" বলতে বলতে গদাধর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে।

রানী রাসমণির অসুখ। হঠাৎ একদিন পড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা পেলেন। শয্যাশায়ী হলেন একেবারে।

মনে শান্তি নেই রাসমণির। দক্ষিণেশ্বরের পুজোর খরচ চালানোর জন্য দু'লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকায় তিন লাট জমিদারি

কিনেছেন কিন্তু এখনো সেই সম্পত্তি দেবোত্তর করেননি। চার মেয়ের মধ্যে দু' মেয়ে শুধু বেঁচে আছে। এই দু' মেয়ে যদি লিখে দেয় ঐ সম্পত্তিতে তাদের কোন দাবি-দাওয়া নেই, তাহলেই সব গোল চুকে যায়। ছোট মেয়ে জগদম্বা এক কথায় লিখে দিল। কিন্তু বড় মেয়ে পদ্মমণি লিখে দিল না কিছুতেই।

"পদ্ম কেন সই করলে না? কেন এমন হল?" রানী কাতর চোখে তাকালেন চারদিকে।

তাকিয়ে দেখেন সামনে গদাধর।

"নাই বা সই করেছে মেয়ে। মা কি মামলা করে পেটের ভাত যোগাড় করবে, না মেয়ে লড়তে পারবে মায়ের সঙ্গে?"

রানীর চোখে মুখে শান্তি ও তৃপ্তির উল্লাস। "বাবা এলে? বাঁচলুম। তোমার ঠাকুর, তুমিই রক্ষা করো। পায়ের ধুলো দাও বাবা।"

উঠে বসতে গেলেন রানী। কই, ঘরে কেউ নেই তো! ভয়ে, আনন্দে ও উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন রাসমণি, "মথুর, জগ, হরি···"

ছুটে এল জগদম্বা, হরি। ছুটতে ছুটতে এলেন মথুরামোহন। কি হল!

অভয় পেয়েছেন রানী। দানপত্র করতে আর বাধা নেই। সজ্ঞানে দানপত্রে সই করলেন রাসমণি। আঠারোশো একষট্টি সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারী।

পরের দিন। সন্ধ্যাবেলায় রাসমণি বললেন, "মথুর, আমাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে চল।"

বিছানা সাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে আনা হল আদিগঙ্গার তীরে বাঁধান ঘাটের উপর। অমাবস্যার অন্ধকার রাত। হঠাৎ মাঝরাতে রানী বলে উঠলেন, "আলো নেবাও, মা আসছেন···"

চোখ বুজে ঢলে পড়ল রাসমণির নির্জীব দেহ। মায়ের কাছে চলে গেল তাঁর পুণ্যময় আত্মা।

দক্ষিণেশ্বরের ঘরের বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল গদাধর। হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, "চলে গেল রে হৃদে, চলে গেল।"

হৃদয় চমকে উঠে বলল, "কে?"

"রাসমণি।···মায়ের অষ্টনায়িকার এক নায়িকা।"

রানী মারা যাবার পর তাঁর সম্পত্তির অছি হলেন মথুরবাবু। ভাবলেন, রানীমার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু জমি জায়গা লিখে দেবেন গদাধরের নামে।

সে কথা জানতে পেরে বাঁশ নিয়ে গদাধর তেড়ে এল মথুরামোহনকে, "কিরে শালা, আমাকে বিষয়ে বেঁধে ফেলবার মতলব?"

ছুটে পালিয়ে গেলেন মথুরামোহন। রুখে এল কর্মচারীরা। মথুরামোহন তাদের বাধা দিলেন।

এগার

সকাল বেলা। বাগানে ফুল তুলছে গদাধর। এমন সময় বকুলতলার ঘাটে একটি নৌকা এসে ভিড়ল।

গদাধর তাকাল সেদিকে। একজন স্ত্রীলোক নামছে নৌকা থেকে। সুন্দরী। পরনে গেরুয়া শাড়ি, হাতে ত্রিশূল।

কে এল আবার? ঘরে ফিরে এসে বলল হৃদয়কে, "হৃদে, ডেকে নিয়ে আয় তো ভৈরবীকে।"

"কোথায় ভৈরবী?"

"চাঁদনীতে বসে আছে। তাকে এখানে আসতে বল।"

"ডাকলেই আসবে কেন? মেয়েমানুষ তো!"

"আসবে। গিয়ে বল আমি ডাকছি।"

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল হৃদয়। গিয়ে বলল, "মামা আপনাকে ডাকছে।"

কোন কথা না বলে উঠে এলেন ভৈরবী। হৃদয় চলল আগে আগে পথ দেখিয়ে।

গদাধরের ঘরের দরজায় এসেই ভৈরবী বললেন, "এই যে বাবা, তুমি এখানে? জানি তুমি গঙ্গাতীরে আছ। তাই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

শুনে গদাধর অবাক্। "তুমি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ মা? কেন?"

"মা মহামায়া জানিয়ে দিলেন। বললেন, এই তিন জনের সঙ্গে দেখা কর্।"

"তিন জন !"

"হ্যাঁ। আর দু'জনের সঙ্গে পূর্ব বাঙলায় দেখা হয়েছে। তুমিই বাকী ছিলে, আজ দেখা হল।"

মা যেন খুঁজে পেল ছেলেকে। আর ছেলেও মাকে। গদাধর বলল, "মা, কে তুমি? কেন তোমার এই বেশ?"

ভৈরবী বললেন, "গেরুয়া নিয়ে অতীত পরিচয় দিতে নেই। তবে শুনে রাখো আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে। কুমারী। ব্রহ্মচারিণী। গুরুদত্ত নাম যোগেশ্বরী।"

বয়স হয়েছে ভৈরবীর। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু কী রূপের ছটা! চোখের কী জ্যোতিঃ!

"পুজোর একটু প্রসাদ খাও মা।" কিছু মাখন আর মিছরি ভৈরবীর হাতে তুলে দিল গদাধর। হেঁকে বলল, "ওরে হৃদে, ডাব কেটে দে মাকে।"

"ছেলে না খেলে কি মা আগে খায় কখনো?" ভৈরবী আপত্তি করলেন। গদাধর তখন মুখে তুলে দিল খানিকটা। ভৈরবী জলযোগ করলেন।

হৃদয়ের সঙ্গে ভৈরবী ঘুরে ঘুরে দেখলেন ঠাকুরবাড়ি। ভাঁড়ারীর কাছ থেকে হৃদয় এনে দিল চাল ডাল তেল নুন। মন্দিরের ভাঁড়ার সব সময় খোলা আছে সাধু অতিথিদের জন্য।

পঞ্চবটীতে বসে রান্না করলেন ভৈরবী। ঝোলা থেকে বের করলেন খান কয়েক পুঁথি ও ইষ্টমূর্তি রঘুবীর শিলা। ভোগ নিবেদন করে ডাকলেন গদাধরকে।

গদাধর এল। ভৈরবী বললেন, "প্রসাদ নাও।"

গদাধর খিচুড়ি খেল মহানন্দে। এমনি করে সে কামারপুকুরে মহাবীরের প্রসাদ খেত।

পঞ্চবটীতে থাকেন ভৈরবী। মুক্ত আকাশের নীচে, গাছের

তলায়। গদাধর বসে গিয়ে সেখানে। ভৈরবী ঝোলা থেকে বের করেন তন্ত্রশাস্ত্র, গীতা, ভাগবত। পড়ে শোনান। কত কথা বলেন। শেষ হয় না কথার আর জিজ্ঞাসার। এ এক নতুন ভাব… অন্তরঙ্গ ভাব।

"মাগো, আমার গায়ে এত জ্বালা কেন? গঙ্গায় ডুবে বসে থাকি। জ্বালা তো যায় না।"

"ও তো দেহের জ্বালা নয় বাবা। জলে জুড়োয় নাকি ও জ্বালা?"

"কিসের জ্বালা তবে?"

"ও জ্বালা মনের। মহাভাবের।"

"তুমি তো পুঁথিতে পড়েছ অনেক কিছু। দাও না এ জ্বালা জুড়িয়ে। ঘুমোতে পারি না। ছ'মাস চোখের পাতা ফেলিনি। সবাই বলে পাগল। হলধারীও আমাকে পাগল বলে মা। সত্যি কি আমি পাগল হলাম?"

ভৈরবী গদাধরের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। "তুমি ভেবো না বাবা। আমি জুড়িয়ে দেব এই জ্বালা। ওরা কিছু জানে না, তাই তোমাকে পাগল বলে। ওরা তো জানে না তুমি কে।"

দূরে দাঁড়িয়ে গোমস্তা চৌকিদার সবাই এসব ব্যাপার দেখে। হাসে মুখ টিপে। বিদ্রূপও করে।

"আগেই বলেছিলাম। জমি ঘেরা হল, আশ্রম হবে, ভৈরবীও আসবে। এখন আর বাকী রইল কি?"

সদরে গেল বেনামী চিঠি। মথুরবাবু তাই না এসে পারলেন না। এসেই গঙ্গার ঘাটে দেখলেন সিক্তবসনা ভৈরবীকে। শিউরে উঠলেন। সর্বনাশ! পঞ্চবটীতে এ আবার কি? উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা… কে এল মহাতাপসের ধ্যান ভাঙাতে! কে এল কলঙ্ক আরোপ করতে পবিত্র দক্ষিণেশ্বরের নামে?

ভৈরবীর সঙ্গে আবার মথুরামোহনের দেখা হল ভবতারিণীর মন্দিরের দরজায়। মথুর বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই শুধালেন, "ভৈরবী তো হয়েছ, ভৈরবটি কোথায় ?"

স্থিরভাবে মা কালীর পায়ের তলায় শিবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ঐ তো !"

মথুরামোহন বললেন, "পাথুরে শিব যে। জাগাতে পার ওকে ?"

ভৈরবীর চোখ উঠল জ্বলজ্বল করে। বললেন, "জাগাতে না পারলে বৃথাই কি সাধন ভজন করেছি এতকাল ?"

মথুরামোহনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটি কথা। বললেন, "এতই যদি পার তবে গদাধরের গায়ের জ্বালাটা সারিয়ে তোল দেখি। পারবে ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারব। দৃঢ়কণ্ঠেই বললেন ভৈরবী। "আন ফুলচন্দন, সারিয়ে দেব।"

মথুরামোহন তখনই লোকজনদের হুকুম দিলেন। আনা হল চন্দনকাঠ। দাস-দাসীরা চন্দন ঘষতে বসে গেল। অনেক চন্দন চাই যে। সারা গায়ে লেপন করতে হবে। ফুলও অসংখ্য তুলে আনা হল বাগান থেকে।

গদাধরের গায়ে চন্দন মাখানো হল। পরানো হল ফুলের মালা, ফুলের গয়না। সারা গা ভরা শুধু ফুল আর চন্দন।

পর পর তিন দিন এমনি করে সাজান হল গদাধরকে। তিন দিন পরে গদাধর নাচতে নাচতে বলল, "সেরে গেছে, সেরে গেছে জ্বালা ! একটুও নেই।"

হৃদয় ছুটে এল। মথুরামোহন এলেন। এলেন হলধারীও। গদাধর সবার সামনেই নাচতে নাচতে বলল, "একটুও জ্বালা নেই। শরীর জুড়িয়েছে আমার। আঃ, কী মজা !"

যেন এক শিশু নাচছে মনের আনন্দে ! •

হলধারী বললেন, "দেখুন পাগলের কাণ্ড !"

ভৈরবী বললেন রাগত স্বরে, "কে বলে ওকে পাগল ? ওকে চেনেন না কেউ আপনারা। আমি একদিন ওর সব লক্ষণ মিলিয়ে দেখেছি ভক্তিশাস্ত্রের সঙ্গে। সব ক'টি মিলেছে।"

মথুরামোহন আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, "কি দেখলেন ?"

"মানবরূপী শ্রীরামচন্দ্র গদাধর।"

সবাই স্তব্ধ, স্তম্ভিত ভৈরবীর কথায়। কিছুক্ষণ পর হলধারী বললেন, "দশটার বেশী তো অবতারের উল্লেখ নেই শাস্ত্রে। বাকী রয়েছে শুধ্ কল্কি—"

ভৈরবী বললেন, "কে বলে ? শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা আছে। এর পরেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' আমার কথা না মানেন বৈষ্ণবাচার্যদের ডাকুন। শাক্ত শৈবদের ডাকুন। সভা বসান। আমি সবার সামনে প্রমাণ করব গদাধর মানবদেহধারী শ্রীরামচন্দ্র।" বলে মন্দিরের চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ভৈরবী।

মথুরামোহন পণ্ডিতদের ডাকলেন। এলেন বৈষ্ণবচরণ, পরম বৈষ্ণব, দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক পণ্ডিত এলেন।

বসল পণ্ডিত-সভা। ভৈরবী যা যা দেখেছেন, যা যা শুনেছেন সব কিছু খুলে বললেন। মহাপুরুষদের জীবনে যে সব লক্ষণ বিকাশের কথা রয়েছে ভক্তিশাস্ত্রে—সে সব কথারও উল্লেখ করলেন। তারপর বৈষ্ণবচরণকে লক্ষ্য করে বললেন, "যে সব ভাব-লক্ষণ আমি প্রত্যক্ষ করেছি সে সব পূর্ণ মহাভাবের। তাই আমার বিশ্বাস গদাধর মানবরূপী অবতার। আপনি কি মানেন ? যদি না মানেন তবে কেন মানেন না বলুন।"

সভার সকলেই কৌতূহলী হয়ে তাকালেন বৈষ্ণবচরণের দিকে। বৈষ্ণবচরণ বললেন, "মা, আমি আপনার যুক্তিই সমর্থন করছি।

ভক্তিশাস্ত্রে যে উনিশটি ভাবের উল্লেখ আছে সে সবগুলোর মিলিত ভাবকেই বলে মহাভাব। মহাভাব ধারণ করবার শক্তি মানুষের নেই। মহাপুরুষরা দু' চারটে মাত্র ধারণ করার অধিকারী! ভক্তিশাস্ত্রের প্রামাণিক তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে আজ স্বচক্ষে দেখলাম গদাধরকে।"

বৈষ্ণবচরণ প্রণাম জানালেন গদাধরকে।

দু'চারদিন পরে এলেন গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। মহাশক্তিশালী তান্ত্রিক। তার্কিক ও পণ্ডিত।

তর্কসভায় যখন তিনি ঢোকেন তখন প্রাণপণ শক্তিতে একটা হুংকার ছাড়েন। কোন স্তোত্রের একটা অংশ আবৃত্তি করেন হয়তো। কিন্তু সেই হুংকার শুনে কেঁপে ওঠে সবাই। কেউ কেউ বলে অমন চিৎকার করেই নাকি তিনি এমন শক্তির অধিকারী হয়েছেন, জয়লাভও করেছেন এমনি ভাবে।

মন্দিরের তোরণের সামনে এসেই গৌরীকান্ত মহাশব্দে হুংকার ছাড়লেন—হা রে রে রে···

নিজের ঘরে চুপচাপ বসে ছিল গদাধর। হুংকার শুনে চমকে উঠল। কোন্ পণ্ডিত এসেছেন তা সে জানে না। কিন্তু যে স্তোত্রের অংশ বলেছেন চিৎকার করে তা সে ধরতে পেরেছে। তাই সেও হুংকার ছাড়ল আরও জোরে—হা রে রে রে···

শুনে চমকে উঠলেন গৌরী পণ্ডিত। আবার হাঁকলেন—হা রে রে রে···

গদাধর আরও জোরে তার জবাব দিল—হা রে রে রে···

হকচকিয়ে উঠল মন্দিরের লোকজন। চৌকিদাররা ছুটে এল লাঠি হাতে। ডাকাত পড়ল নাকি?

কিন্তু একি! বোকা বনে ফিরে গেল সবাই। মুখ গম্ভীর করে গৌরী পণ্ডিত ঢুকলেন মন্দিরে। হুংকারে তাঁকে এমন করে হারিয়ে দিল কে? এমন গলার জোর কার?

মন্দিরের সামনে বিরাট নাটমণ্ডপে বিচারসভা বসল। সভায় ঢুকবার আগে গদাধর মন্দিরে ঢুকল কালী-প্রণাম করতে। কালী-প্রণাম করে বেরিয়ে আসছে এমন সময় বৈষ্ণবচরণ তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। অমনি ভাবসমাধি হয়ে গেল গদাধরের।

গৌরী পণ্ডিত দেখলেন সব অবাক্ হয়ে। কিছুক্ষণ পর সভায় এসে বসলেন বৈষ্ণবচরণ। হৃদয়ের কাঁধে ভর দিয়ে গদাধরও টলতে টলতে সভায় এসে বসল।

সবাই তাকিয়ে আছেন গৌরী পণ্ডিতের দিকে। কি বলেন তিনি!

কিন্তু কী আশ্চর্য! মুহূর্তেই সকলের কৌতূহল মিটিয়ে দিলেন বিরাট শক্তিধর পণ্ডিত ও তার্কিক।

গৌরী পণ্ডিত বললেন, "গদাধর ভগবানের মহাবতরণ। তিনি এসেছেন দুর্গত মানবাত্মাকে সহজ মুক্তির পথ দেখাতে।"

সভা ভেঙে গেল। মথুরামোহন জানবাজারে ফিরে গেলেন অন্তরে গভীর একটা তৃপ্তি নিয়ে। সার্থক রানীমার প্রতিষ্ঠিত মন্দির! ধন্য দক্ষিণেশ্বর!

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সে কিন্তু আপন-ভোলা। কিছুই যেন জানে না সে। সে চায় নিজের জীবনে ঈশ্বরের অনুভূতি-বোধ থেকে বোধির আস্বাদ।

ভৈরবী এসে বললেন, "আসন তৈরি করেছি বাবা। বাগানের উত্তর সীমায় ত্রিমুণ্ডাসন।"

চমকে উঠল গদাধর, "ত্রিমুণ্ডাসন!"

"হ্যাঁ, তন্ত্রমতে তাই বিধি। আর একটা করেছি পঞ্চবটীর নীচে। পঞ্চমুণ্ডী। পাঁচটা মাথার আসন।"

"পাঁচটা মাথা!"

"হ্যাঁ! চারিদিকে শেয়াল, সাপ, কুকুর আর মহিষের মাথা।

মাঝখানে মানুষের। পঞ্চমুণ্ডী। প্রথমে বেলতলার ত্রিমুণ্ডাসনে, পরে পঞ্চবটিতে পঞ্চমুণ্ডীতে বসে সাধবে শ্যামা মাকে।"

গদাধর কেমন যেন ভীতি-বিহ্বল! বলল, "তাই বলে মাথার আসন কেন গো?"

ভৈরবী বললেন, "এই তো তান্ত্রিকী সাধনা। ভয় কি বাবা? ভয় পেলে মাকে দেখবে কোন্ শক্তিতে?"

চুপি চুপি মায়ের মন্দিরে গিয়ে শুধায় গদাধর, "মাগো, ভৈরবী বলছে তন্ত্রমতে সাধন করতে, করবো? সে যে মড়ার মাথায় বসে সাধনা।"

নড়ে উঠল যেন মায়ের প্রতিমা। অট্টহাসি করে উঠল যেন গলার ছিন্নমুণ্ডগুলি।

'মড়ার মাথা কি রে! লোভ হিংসা কাম দম্ভ ও ঘৃণার ছিন্ন মাথা পেতেই তো পঞ্চমুণ্ডী।'

কালীমন্দিরে বসে গদাধরকে দীক্ষা দিলেন ভৈরবী। তান্ত্রিকী শাক্তী-দীক্ষা।

ঠাকুর বলেছিলেন, "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করবে।" অথচ এক নারী হলেন তাঁর গুরু!

তার অর্থ হল নারীর মধ্যে যে কামিনী, যে তামসী থাকে তাকে ত্যাগ করবে।

ভৈরবী বললেন, "তোমার এখনো স্ত্রীলোক দেখে ভয়? তোমার তবে এখনো পূর্ণজ্ঞান হয়নি।"

নিশুতি রাত। ফুটফুটে জ্যোছনা। ভৈরবী নিয়ে এলেন এক অচেনা যুবতীকে। পূর্ণযৌবনা, সুন্দরী।

ভৈরবী তাকে বেদীর উপর বসালেন। গদাধরকে বললেন, "বাবা, একে দেবীজ্ঞানে পূজা করো।"

স্ত্রী-মাত্রেই জননী। গদাধর চোখ বুজে জগদম্বাকে স্মরণ করতে লাগল।

ভৈরবী বললেন, "চোখ খোল। বসো এর কোলে।"

চোখ খুলে চমকে উঠল গদাধর। নারী উলঙ্গিনী।

"ও যে উলঙ্গিনী! ওর কোলে বসা যায়?"

"কেন বসা যায় না? রমণী জননী। স্ত্রী-অঙ্গ মাতৃ-অঙ্গ। তুমিও নগ্ন হয়ে বসো ওর কোলে।"

রমণীর কোলে উলঙ্গ হয়ে বসেই সমাধিস্থ হল গদাধর।

ভৈরবী বললেন, "তুমি পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে বাবা।"

একদিন মড়ার মাথার খুলিতে মাছ রেঁধে ভোগ সাজালেন ভৈরবী। কালীকে নিবেদন করে বললেন, "প্রসাদ নাও।"

গদাধর নির্বিবাদে প্রসাদ নিল।

তারপর ভৈরবী কোথেকে পচাগলা নরমাংস যোগাড় করে আনলেন। কী দুর্গন্ধ! কালীকে নিবেদন করে বললেন, "এ মাংস জিভে ঠেকাও।"

"ছিঃ, এ আমি পারব না।" মুখ বাঁকাল গদাধর।

"ঘেন্নার কি! কোন কিছুতে ঘেন্না করতে নেই। এই দেখ আমি খাচ্ছি।" বলেই নিজের মুখে কিছুটা ফেলে চিবুতে লাগলেন ভৈরবী।

দেখেই 'মা', 'মা' বলে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ল গদাধর। ভৈরবী অমনি একটুকরো মাংস তার মুখে ফেলে দিলেন।

বছরের উপর কেটে গেল তন্ত্র-সাধনায়। প্রক্রিয়ার পর প্রক্রিয়া, প্রত্যক্ষ দর্শনের পর আরও দর্শন। কিভাবে যে এতগুলি দিন কেটে গেল টেরও পাননি গুরু শিষ্য কেউ।

মথুরামোহন শুধালেন, "আর কতদিন লাগবে বাবা?"

"কি জানি, গুরু-মা জানেন।" বলেই গদাধর চুপ হয়ে গেল। তারপর আবার বলল, "মাকে ডাকার আর দেখার শেষ কি গো! এর কি শেষ আছে?"

বার

রামকুমারের ছেলে অক্ষয়কে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন চন্দ্রমণি। মনের একান্ত সাধ, বাকী জীবনটা গঙ্গাতীরে থাকবেন. গদাইকেও দেখবেন।

মাকে কাছে পেয়ে গদাধরের কী আনন্দ! রোজ ভোরে উঠে মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নেয়, সারা গায়ে মাখে। শুধায়, "কেমন আছ মা?"

চন্দ্রমণি বলেন, "বেশ আছি বাবা! গঙ্গা, মায়ের বাড়ি আর তোকে একসঙ্গে পেয়েছি। এই তো আমার স্বর্গ।"

মথুরামোহন নিজে যত্ন সহকারে চন্দ্রমণির থাকা-খাওয়ার সমস্ত সুখ-সুবিধা করে দিয়েছেন। গদাধরের ঘরের কাছাকাছি নহবত ঘরের নীচে থাকেন চন্দ্রমণি।

মথুর বলেছিলেন, "কুঠির যে কোন একটা ঘরে থাকুন মা।"

চন্দ্রমণি বলেছিলেন, "না বাবা, এখানটাই ভাল। গদাইকেও দেখি, গঙ্গাও দেখি।"

শ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ নিরামিষ। রোজ দুবেলা সেই ভোগের প্রসাদ আসে। পরম তৃপ্তিতে চন্দ্রমণি সেই প্রসাদ পান।

মথুরামোহন তাঁর স্ত্রী জগদম্বাকে নিয়ে এলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে। দু'জনেই চন্দ্রমণিকে প্রণাম করলেন। জগদম্বাকে কোলের কাছে বসিয়ে চন্দ্রমণি আদর করলেন! "বেঁচে থাক মা। সতী সাবিত্রী হও।"

মথুরামোহন বললেন, "ঠাকুরমা, তোমার আর কি চাই বল। কই, তুমি তো কিছু চাওনা আমার কাছে ?"

চন্দ্রমণি বললেন, "কি আর চাইব বাবা! না চাইতেই তো তুমি দিয়েছ সব।"

"তাই বলে কি আমার কিছু দেবার ইচ্ছা হয় না ?"

"তা দিতে যখন চাও বাবা, চার পয়সার দোক্তাপাতা দিও। আমার দোক্তা ফুরিয়ে গেছে।"

অবাক্ হয়ে গেলেন মথুরামোহন। "এমন মা না হলে কি তার ঘরে এমন ছেলে হয়। কী নির্লোভ নিরাসক্ত মন!"

ঠাকুরবাড়ির ছোট একটা ঘরে থাকেন ভৈরবী যোগেশ্বরী। মথুরামোহনই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দিনরাত জপধ্যানে মেতে থাকেন। গদাধরের সঙ্গে দেখা হয় রোজ।

ভৈরবী বললেন, "তন্ত্রসাধন করে তো সিদ্ধিলাভ করলে। এমন কেউ পারে না।"

গদাধর বলে, "ওসব তো তোমারই জন্যে মা। তুমিই তো পথ দেখালে, শেখালে। আমি তো জানতাম না কিছুই। পড়তেও পারতাম না ওসব পুঁথি পুরাণ ভাগবত।"

"এবার বৈষ্ণবমতে সাধনা কর বাবা।"

"বৈষ্ণবমতে সাধনা!"

"হ্যাঁ। চারখানি বেদ, আঠারোখানি পুরাণ, চৌষট্টি তন্ত্রে যে রস মেলে না, তাই মেলে বৈষ্ণবমতে রসাল সান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব সাধনে। সাধবে না তুমি ?"

"মাকে জিজ্ঞেস করি।"

মন্দিরে এসে প্রতিমার পায়ে প্রণাম করে গদাধর শুধাল, "মা গো, ভৈরবী বলছে বৈষ্ণবমতে সাধতে। সাধবো ?"

নড়ে উঠল যেন প্রতিমা। ভাবে বিভোর গদাধর। তার চার-দিক ঘিরে যেন বেজে উঠল নূপুর, মধুর মুরলী · শ্যামের অপরূপ নৃত্যছন্দ।

কী যোগাযোগ! দলে দলে সাধুসন্ত বৈষ্ণব বাবাজীরা আসতে লাগলেন দক্ষিণেশ্বরে। গদাধর তাঁদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়, ভাঁড়ারীকে বলে কাপড় কম্বল কমণ্ডলু বিলি করে। সাধুরা বিদায় নেবার সময় আশীর্বাদ করে যান মন্দিরের মালিকদের আর গদাধরকে।

বেদান্তপন্থী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী পরমহংসদেবের দল এলেন একবার। ডেরা করলেন পঞ্চবটীতে। গদাধরের তখন খুব পেটের অসুখ। আমাশা। পঞ্চবটীতে যেতে পারে না। সাধরাই এসে জড়ো হলেন তার ঘরেব বারান্দায়। ব্রহ্ম আর মায়ার স্বরূপ নিয়ে চলল আলোচনা।

এক সাধু বললেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"··· জগতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই।

গদাধর শুধাল, "তুমি আমি জল বায়ু মাটি বহ্নি ব্যোম? এই বিচিত্র জগৎ?"

"সব মায়া। সব মিথ্যা!"

"মিথ্যা কেন গো! ব্রহ্ম সত্য তো জগৎও মিথ্যা নয়। ব্রহ্ম সত্য তো তুমি আমি কেউ মিথ্যা নয়।"

সাধুরা হই-হই করে উঠলেন, "কি রকম?"

গদাধর বলল, "মাখনেরই ঘোল, ঘোলেরই মাখন। মাখন আছে তো ঘোলও রয়েছে। আত্মা থাকে তো অনাত্মাও আছে। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। যিনি ঈশ্বর বলে গোচব হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন। বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীব-জন্তু ভাল-মন্দ

সমস্ত। তিনিই জীবজগৎ। ছাদে ওঠ, দেখবে ছাদেও যা সিঁড়িতেও তাই। সেই একই ইট চুন সুরকি!”

“না, না।”

“পরমব্রহ্মের আনন্দময় অস্তিত্ব যদি স্বীকার কর, তবে তাঁর আনন্দঘন সাকার দীপ্তিকে অস্বীকার করবে কেন? অস্তিত্ব প্রকাশ হয়েছে বলেই তো দীপ্তি।”

সাধুদের মধ্যে একজন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, “সত্যি, সত্যি। উপনিষদও তাই বলেছে।”

কয়েকজন সাধু গদাধরকে আশীর্বাদ করে বললেন, “তুমিই বুঝেছ। তুমি পরমহংস।”

চাঁদনিতে আসন করলেন রামায়েত দলের এক সাধু। বৃদ্ধ। মাথায় জটা, পরনে গৈরিক। সঙ্গে সালুতে বাঁধা একটি গ্রন্থ। রোজ গঙ্গাস্নান করে ভক্তিভরে গ্রন্থটিকে পুজো করেন।

গদাধরের কৌতূহল হল। বলল, “বাবাজী, দেখব তোমার বইটি? ওতে কি আছে?”

সাধু বললেন, “দেখ।”

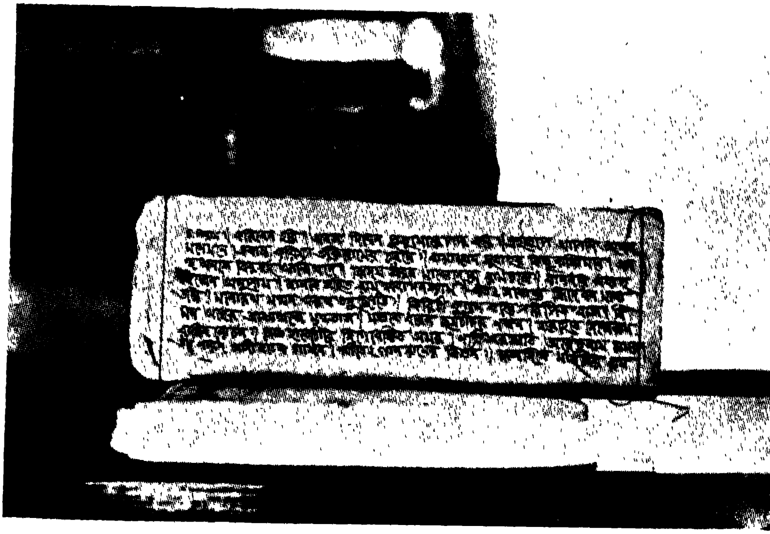
গদাধর খুলে দেখল, বইটির প্রত্যেক পাতায় শুধু লাল কালিতে লেখা দুটি শব্দ—ওঁ রাম। আর কিছুই নেই।

“একি বাবাজী?”গদাধর অবাক্ হয়ে শুধায়।

“ঐ তো সব।” মধুর হেসে জবাব দেন সাধু। “চার বেদ আঠারো পুরাণ সবগুলোতে তো শুধু ওঁরই মহিমা কীর্তন।”

পরম শ্রদ্ধায় গ্রন্থখানি মাথায় ঠেকাল গদাধর।

কিছুদিন বাদে এলেন জটাধারী। উনিও রামায়েত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। সঙ্গে অষ্টধাতুতে গড়া শিশু রামমূর্তি। জটাধারী আদর করে ডাকেন, “রামলালা”।



ঠাকুরের হস্তলিপি



পঞ্চবটী—দক্ষিণেশ্বর

রামলালাকে নিয়ে গঙ্গায় স্নান করেন। রেঁধে বেড়ে ভোগ দেন। প্রসাদ নেন ভোগশেষে। রাত্রিতে রামলালাকে বুকে করে ঘুম পাড়িয়ে তবে ঘুমান।

গদাধর দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর অবাক্ হয়ে যায়। দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়ায় যেন মা।

সত্যই দুরন্ত শিশু রামলালা। গদাধরের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে। আড়চোখের কি দুষ্টু চাউনি! ভারী দুষ্টু তো!

কদিনের মধ্যেই রামলালার সঙ্গে কী ভাব হয়ে গেল গদাধরের!

"তুমি হাসছ কেন মামা?" হৃদয় এসে ঝাঁকুনি দেয় ভাবাবিষ্ট গদাধরকে।

"হাসবো না? দ্যাখ্ না রামলালা কী দুষ্টুমি করছে।"

"ওতো অষ্টধাতুর মূর্তি।" মুখে বলে হৃদয় আর মনে মনে ভাবে, "সর্বনাশ! আবার বায়ু চড়েছে মামার।"

গদাধর শুনতে পায় হৃদয়ের মনের কথা। তাই বলে, "না রে! আমি যেই ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াই অমনি রামলালা আমার পেছনে পেছনে ছোটে। জটাধারী ধমকায়, বারণ করে। কই, বারণ শোনে না তো!"

ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর রোদ। গদাধর বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে!

"ওরে যাস্‌নে। কী রোদের তাত! গায়ে ফোসকা পড়বে যে রে।"

হৃদয় তার ঘর থেকে এসে বলে, "কি হল মামা?"

"কি আর হবে? দ্যাখ্ না কেমন দুষ্টুমি করছে। এসে কোলে উঠতে চাইল, কোলে নিলাম। ঝাঁ করে নেমে ঐ কাঁটা বনে ফুল তুলতে গেল। কত ছুটোছুটি করে ধরে নিয়ে এলাম। আবার ছুটে পালাল।"

"কোথায় মামা ?"

"ঐ ছাখ্ না, রোদে ছুটছে আর হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। বলছে, আয় খেলা করি।"

"কই, আমি দেখছি না তো।"

"ঐ তো। ঐ যে গঙ্গার দিকে ছুটলো। একি, গঙ্গায় নামলো যে রে। ধর্ ধর্।"

গদাধর ছোটে। হৃদয়ও ছোটে তার পেছনে পেছনে।

"ওরে, জল ঘাঁটিস নে। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে যে। জ্বর হবে। তখন বুঝবি মজা। আয়, আজ মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করবো।"

একদিন আদর করে খই খেতে দিল রামলালাকে। খইয়ের ভেতর ছিল ধান। ধানে রামলালার নরম জিভ চিরে গেল। কষ্টে বুক ফেটে গেল গদাধরের। রামলালাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার কী কান্না।

ষাট্ ষাট্! তোর এ কচি মুখে মা কৌশল্যা তুলে দিতেন ক্ষীর ননী। আর আমি দিলাম ধানসুদ্ধ খই!

ভোগ রান্না হয়ে গেছে, জটাধারী খুঁজছে রামলালাকে। কোথায় রামলালা? খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখে গদাধরের সঙ্গে খেলা করছে।

রাগে ও অভিমানে ভেঙে পড়েন জটাধারী। "বেশ ছেলে তুমি! আমি খুঁজে হয়রান্ হচ্ছি আর তুমি এখানে দিব্যি খেলে বেড়াচ্ছ!"

জটাধারী দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যেতে পারেন না। রামলালা যে ছাড়ে না গদাধরকে। কখন চুপি চুপি পালিয়ে আসে জটাধারী টেরও পায় না।

একদিন ছলছল চোখে জটাধারী এসে দাঁড়ালেন গদাধরেব সামনে। বললেন, "আমি চললাম।"

চমকে উঠে গদাধর শুধাল, "তোমার রামলালা?"

"সে থাকবে তোমার কাছে। আজ সে আমায় দর্শন দিয়েছে

তার নিজের মূর্তিতে। বলেছে সে এখানেই থাকবে। তাই তোমার কাছে ওকে রেখেই আমি চললাম।"

রামলালাকে গদাধরের কোলে দিয়ে জটাধারী চলে গেলেন। রামলালা রইল গদাধরের কাছে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়িতে।

গদাধর আপন মনে গান গাইছিল ঘরের বারান্দায় বসে। ভৈরবী পাশে এসে বসলেন।

মধুর ভাবের কথা উঠল। ভৈরবী বললেন, "বৈষ্ণব মতে এই মধুর ভাব সাধন খুব শক্ত। এই ভাবের প্রচার করেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। তিনিই বৈষ্ণব সাধকদের সাধনার পথে প্রেমময়ী শ্রীরাধার আদর্শ তুলে ধরেছেন। স্বার্থহীন কামগন্ধহীন অপার্থিব সমর্থা প্রেমের আদর্শ।"

"সমর্থা প্রেম!" গদাধরের কৌতূহল জাগে।

"তুমিই সুখী হও। তোমার তুষ্টি, তোমার তৃপ্তি যাতে হয় তাই করবো। দেহ, মন, মান, অহমিকা সব নাও। বিনিময়ে কিছুই আমি দাবি করি না। তোমার তুষ্টিতেই আমার তুষ্টি···আমার ইহকাল পরকাল। এই হল সমর্থা প্রেম।"

গদাধর অবাক্ হয়ে শোনে।

ভৈরবী বলেন, "আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণই জগতে একমাত্র পুরুষ। আর সবই তাঁর লীলাময়ী প্রকৃতির অণু-পরমাণু। তাই সবই তাঁর স্ত্রী। তিনিই একা পতি।"

"এই সাধনাই করব আমি।" নেচে ওঠে গদাধরের মন।

মথুরামোহন আসতেই গদাধর বলল, "সেজবাবু গো, আমাকে নারী সাজিয়ে দাও।"

মথুরামোহন অবাক্ হয়ে বললেন, "কেন?"

গদাধর বলল, "মধুর ভাবে সাধবো।"

"বেশ তো, সাধুন না। তাই বলে নারী সাজবেন কেন?"

"ভাবের বৃন্দাবনে সবাই যে নারী গো। শুধু এক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। আর সবাই যে শ্রীপদ সেবিকা প্রেমিকার দল।"

মথুরামোহন কিনে দিলেন সব। শাড়ি ঘাগরা ওড়না-কাঁচুলি থেকে শুরু করে মাথার পরচুলা পর্যন্ত। সোনার গয়না, রুপোর নূপুরও এনে দিলেন। গদাধর নারী সাজল। ভাবে ভঙ্গীতে চলনে-বলনে একেবারে নারী। সেবিকা প্রেমিকা গোপিনী।

গোপিনী বেশে মন্দিরে গিয়ে মা কালীকে চামর করতে করতে বলে, "মা গো, দেখা আমায় মধুর ঘনশ্যামকে। তুই শ্যামা, শ্যাম হয়ে দেখা দে আমাকে।"

অন্তর থেকে আদেশ আসে। করুণাঘন মধুর ঘনশ্যামের সর্বাধিকারিণী রাধা। তাঁকে তুষ্ট কর্ আগে। রাধারানীর কৃপা হলে তো মিলবে কৃষ্ণদর্শন।

ধ্যানে বসল গদাধর। রাধারানীর কৃপালাভের জন্য কী তার আকুল মিনতি!

দেখা দাও। আমি তোমারই সখী, তোমারই সঙ্গিনী। বিরহের জ্বালা যে কী ভীষণ তা তো তুমি জান। তবে কেন দেখা দাও না?

ঠাকুরবাড়ির সামনে ফুলের বাগান। ফুটফুটে পূর্ণিমার জ্যোছনা। শিউলিঝরা পথের উপর এসে দাঁড়ালেন রাধারানী। নয়নমনোহর মূর্তি।

মুহূর্তেই মূর্তি মিলিয়ে গেল। কোথায়? সে যেন গদাধরের দেহের মধ্যেই। গদাধর হল রাধাময়ী।

কেঁদে কেঁদে আকুল গদাধর। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য যেন ব্যাকুল শ্রীরাধা। ওলো, আমার কৃষ্ণকে এনে দে। এনে দে। নইলে যে আমার প্রাণ বাঁচে না।

বিষ্ণু ঘরের সামনে, দালানে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। গদাধর শুনছে তন্ময় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী।

ভাবাবিষ্ট গদাধর দেখল, সামনেই জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর পা থেকে একটা জ্যোতির ছটা বেরিয়ে এসে ভাগবত স্পর্শ করল। তারপর লাগল গদাধরের বুকে। সেখান থেকে সেটা আবার ফিরে গেল শ্রীকৃষ্ণের পায়ে।

বুঝতে পারল গদাধর। ভগবান্, ভাগবত আর ভক্ত এক। একেই তিন, তিনেই এক।

তের

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। আকাশ তখনও ফরসা হয়নি।

চাঁদনীর সিঁড়িতে ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে গদাধর। হঠাৎ দেখল দীর্ঘকায় জটাজ‌ুটধারী উলঙ্গ এক সন্ন্যাসী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল গদাধর।

সন্ন্যাসী শুধালেন, "সাধন ভজন করবে বেটা ?"

"কিসের সাধন ভজন ?" গদাধর অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

"বেদান্ত সাধন। যাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। করবে ?"

"আমি কি জানি ? মা যদি বলে তবে করবো।"

"কোথায় তোমার মা ?"

"ঐ যে মন্দিরে।"

মনে মনে হাসলেন সন্ন্যাসী। ও তো একটি মূর্তি। ও আবার মা হয় কি করে ? ঈশ্বর এক, সত্য। দেবদেবী সব ভ্রম।

"যাও, মাকে জিজ্ঞেস করে এসো। তিন দিনের বেশী থাকি না কোথাও। এখানেও থাকবো না।"

গদাধর চলে গেল মন্দিরে। ফিরে এল হাসিমুখে। আদেশ পেয়েছে মার।

এসে বলল, "আপনি কি তোতাপুরী ?"

সন্ন্যাসী অবাক্। "তুমি আমার নাম জানলে কি করে ?"

"মা বলেছে, মোহান্ত তোতাপুরী এসেছে তোকে বেদান্ত সাধন শেখাতে।"

"হ্যাঁ, আমি তোতাপুরী।"

তোতাপুরীই সন্ন্যাসীর নাম। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় তাঁর মঠ ছিল। সাধনা করেছেন চল্লিশ বছর। ব্রহ্মসাক্ষাৎ হবার পর তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গঙ্গাসাগর আর শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে তারপর এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

"আমাকে দীক্ষা দিন।"

"প্রথমে শিখাসূত্র ছাড়তে হবে।"

"ছাড়ব।"

"পরতে হবে গৈরিক।"

"তা পারব না।"

"কেন?"

"ছেলেবেলায় মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, কৌপীন পরব না, গেরুয়া পরব না।"

"ও তো ছেলেবেলার কথা।"

"হোক ছেলেবেলার কথা। তবু তো মাকে কথা দিয়েছি, তা পালন করতে হবে। সন্ন্যাসী না সেজে সন্ন্যাস নেব। হবে না? তুমিও তো গেরুয়া পর না।"

"বেশ, তাই হবে।" মনে মনে ভাবেন তোতাপুরী, মনে যার রং ধরেছে, তার দেহাবরণের রং বিচার কেন?

গদাধর বলল, "আরও এক কথা। আমি বিবাহিত। স্ত্রীকেও ত্যাগ করতে পারব না।"

তোতাপুরী বললেন, "দরকার নেই। স্ত্রীকে কাছে রেখেই হবে তোমার কাম ও কাঞ্চন ত্যাগের পরীক্ষা।"

পঞ্চবটীর তলায় ধুনি জ্বেলে আসন পাতলেন তোতাপুরী। বললেন, "সাধন কুটীরে জড়ো করো পূজা ও হোমের উপচার। শুভ মুহূর্ত এলে খবর দেব।"

নহবতের ঘরে এসে গদাই চন্দ্রমণিকে বলল, "মা গো, বৈদিক সন্ন্যাসী তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত সাধন করব। ক'দিন আসতে পারব না তোমার কাছে।"

চমকে উঠলেন চন্দ্রমণি। "সে কি! সন্ন্যাস নিয়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে যাবি নাকি?"

"না মা, যেমন আছি, তেমনই থাকব। তুমি শুধু আশীর্বাদ কর মা।"

ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে চন্দ্রমণি বললেন, "রঘুবীর, রঘুবীর।"

ভৈরবী বললেন, "ঐ নাগা সন্ন্যাসীর কাছে এত যাও কেন তুমি?"

গদাধর বলল, "আমাকে বেদান্ত সাধন করতে বলে যে।"

"ওসব পথের ধার দিয়েও তুমি যেয়ো না। ওসব ব্রহ্মবাদীদের মতে চললে তোমার প্রেমানন্দের ভাব, ভক্তির ভাব সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

গদাধর তা বিশ্বাস করে না। ভাবে, 'দেখিই না ও-পথটা কেমন!'

শুভ মুহূর্ত এল। নাগা সন্ন্যাসী ডাকলেন গদাধরকে। পঞ্চবটীর সাধন কুটীরে জ্বলে উঠল হোমের আগুন।

তোতাপুরী মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন।

"হে যজ্ঞপতি, হে পরমাত্মন্, আমার সমস্ত প্রাণবৃত্তি তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। তুমি আমাতে প্রকাশিত হও।

"তুমি তো নিত্যকালের প্রকাশ, একবার আমার হয়ে প্রকাশ পেয়ে ওঠো।

"হে ব্রহ্মণ, তুমি সর্বশক্তিমান্। জগতে নানারূপে তুমিই বিরাজমান। দেহমনশুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান ধারণের, ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্যতা লাভের জন্য আমি অগ্নিস্বরূপ তোমাতেই আহুতি প্রদান

করছি। প্রসন্ন হও। অখণ্ড মধুর একত্ববোধের চেতনা আমার অন্তরে জাগ্রত হোক।”

হোম শেষে গদাধরকে দীক্ষা দান করলেন তোতাপুরী।

“আসনে বসো। ধ্যান করো। মনকে নিরাসক্ত নির্বিকল্প করে ধ্যানে মগ্ন হও। ব্রহ্মানন্দে ডুব দাও।”

অনেক চেষ্টাতেও গদাধর মনকে নির্বিকল্প করতে পারে না। স্বভাবের অধীন মন। লীলাময়ী শক্তির সবিকল্প প্রকাশকে কোন মতেই পারে না ভুলতে।

“হল না। মন বশে আসছে না। হল না নির্বিকল্প ধ্যান।”

“হবে, নিশ্চয়ই হবে। হতেই হবে।”

গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শিষ্য ধ্যানস্থ হল।

মনের প্রত্যয়ের কাছে পরাভূত হল বিকল্পের ভাব। হল নির্বিকল্প ধ্যান। মন মিশে গেল অব্যক্ত আনন্দে সচ্চিদানন্দে।

নবজন্ম লাভ হল গদাধরের।

দীক্ষাদানের পর তোতাপুরী বললেন, “এবার তোমাকে নতুন নাম দেব।”

“নতুন নাম?”

“হ্যাঁ। নতুন জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম পদবী সব কিছু বদলে যাবে!”

গদাধর নীরব।

“আজ থেকে তোমার নাম রামকৃষ্ণ। আর পদবী? পদবী হল পরমহংস। পরমহংস কাকে বলে জান তো?”

দুধে জলে একসঙ্গে থাকলেও যিনি হাঁসের মত জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন, তিনিই পরমহংস।

চৌদ্দ

গদাধর হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

তোতাপুরী বললেন, "নিজের মঠ ছাড়া কোথাও আমি ত্রিরাত্রির বেশী থাকি না। এখানেই নিয়মের ব্যতিক্রম হল।"

তিন দিন থাকবেন বলে তোতাপুরী এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। এগারো মাস কেটে গেল তবু যেতে পারলেন না। আটকে গেলেন নতুন শিষ্যের মায়ায়।

কিন্তু বাংলার জলবায়ু সহ্য হল না তোতাপুরীর। দারুণ রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হলেন। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল তাঁর।

রামকৃষ্ণ বললেন মথুরামোহনকে, "আমার গুরুর চিকিৎসা করাও। বাংলা দেশে এসে এমন ভুগবেন?"

মথুরামোহন নামী কোবরেজ ডেকে আনলেন। করলেন চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের ব্যবস্থা।

কিন্তু তোতাপুরীর আস্থা নেই ওষুধের ওপর। তাই রোগও বুঝি সারে না।

রামকৃষ্ণ ছুটে যান মায়ের মন্দিরে। বলেন, "মা গো, ল্যাংটাকে সারিয়ে দে। দুঃখ দিস নে। বড্ড ছটফট করছে যে।"

নিঝুম গভীর রাত্রি। যন্ত্রণায় কাতর তোতাপুরী। একি হল! তুচ্ছ রোগ বাধা দেবে আমাকে পরমার্থ চিন্তায়। না, না, এ হতে পারে না।

গঙ্গার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন তোতাপুরী। জলে ডুবে মরবেন।

এগিয়ে চলতে লাগলেন নাগা সন্ন্যাসী। কিন্তু কোথায় জল

গঙ্গায় ? গঙ্গা কি শুকিয়ে গেল ? কাদাও যে লাগে না পায়ে।

আরো এগিয়ে গেলেন। পড়লেন ঝাঁপিয়ে গঙ্গার জলে। কিন্তু ডুবলেন না তো ! কে এসে ধরলেন তাঁকে ? মা কি !

অভিভূত জ্ঞানহারা তোতাপ

পরদিন রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর সাধন কুটীরে গিয়ে দেখলেন, তোতাপুরীর দেহে রোগের চিহ্নমাত্র নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে গেছেন গুরুজী।

"এ কি হল ? অসুখ সেরে গেল তোমার ?"

"হ্যাঁ। তোমার মাকে দেখলাম কাল।"

"আমার মাকে ?"

"হ্যাঁ। জগতের মাকে।"

"দেখতেই হবে। আমার মাকে না দেখে কি তুমি যেতে পার ?"

দু'দিন পরে রামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে নিয়ে গেলেন মায়ের মন্দিরে। তোতাপুরী নয়নভরে ভবতারিণীকে দেখলেন। প্রণাম করলেন বার বার।

তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

তোতাপুরী চলে যাওয়ার ক'দিন পরেই কোথা থেকে এল গোবিন্দ রায়।

জাতে ক্ষত্রিয়। কিন্তু মুসলমান হয়েছে। আরবী ফারসীতে পণ্ডিত। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে রামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন।

একদিন বললেন রামকৃষ্ণ, "আমি মুসলমান ধর্মমতে সাধন-ভজন করব।"

"মানে ?" অবাক্ হয়ে গেল গোবিন্দ রায়।

"কত মানুষ কত পথে সাধনা করে বাঞ্ছিত ধামে গিয়ে পেঁছিল। আমি এ পথটাকে বাদ দেব কেন ?"

গোবিন্দ রায় দীক্ষা দিল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ কাছা খুলে ফেললেন। কাপড় পরলেন লুঙ্গির মত করে। পাঁচ বেলা নমাজ পড়তে লাগলেন।

একদিন মথুরাবাবুকে বললেন, "মুসলমানের রান্না খাব !"

"সে কি কথা !"

"হ্যাঁ, খুব ঝাল পেঁয়াজ রসুন দেওয়া রান্না।"

"বেশ, মুসলমান বাবুর্চি দেখিয়ে দেবে, রাঁধবে হিন্দু বামুন।"

রামকৃষ্ণ তাতেই রাজী হলেন।

বামুন রান্না করছে। রামকৃষ্ণ বললেন, "না না, ঠিক হচ্ছে না। বামুনকেও কাছা খুলে ফেলতে হবে।"

বামুনকে তাই করতে হল।

সানকিতে করে ভাত খেলেন রামকৃষ্ণ। জল খেলেন বদনাতে করে।

সকালবেলা। আজান দিয়েছে মসজিদ থেকে। রামকৃষ্ণ সেখানেই গিয়ে হাজির।

একদিন মসজিদে নমাজ পড়ছেন রামকৃষ্ণ। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে হাজির হলেন তাঁর সামনে। বৃদ্ধ ফকিরের বেশ। মাথার চুল সব সাদা, গলায় কাচের মালা, হাতে লাঠি।

রামকৃষ্ণকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

রামকৃষ্ণ আর একদিন দেখলেন, একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

যীশু !

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হল। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন তিনি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। এসেছেন ব্যারিস্টার হিসাবে। মথুরাবাবুর বড় ছেলে দ্বারিক ডেকে এনেছে। বারুদঘরের সাহেবদের সঙ্গে যে মামলা চলছে, তারই জন্য এসেছেন মধুসূদন।

দপ্তরখানায় মধুসূদন বসেছেন। বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখব।"

রামকৃষ্ণ যেতে চান না। "এত বড় নাম-করা লোক, তার উপর সাহেব সেজে থাকে। তার কাছে যাব কি গো!"

কিন্তু তাগিদ আসতে থাকে বারবার।

নারায়ণ শাস্ত্রী ছিলেন সামনে। রামকৃষ্ণ বললেন, "তুমিও সঙ্গে চল। ইংরেজী-টিংরেজী জানি না। কি বলতে কি বলব তার ঠিক নেই।"

দু'জনে এলেন মাইকেলের ঘরে। রামকৃষ্ণ ঠেলে দিলেন নারায়ণ শাস্ত্রীকে, "তুমিই কথা বলো।"

নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃতে কথা বলতে লাগলেন। মাইকেল বললেন, "বাংলাতেই বলুন।"

"আপনি নিজের ধর্ম ছাড়লেন কেন?"

"পেটের জন্য।"

"পেটের জন্য পিতৃপিতামহের ধর্ম যে ছাড়ে তার সঙ্গে কথা বলাও পাপ।"

"আপনি কথা বলুন।" রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন মধুসূদন।

"আমি যে কথা বলতে পারছি না। কে যেন মুখ চেপে ধরছে।"

"আমাকে কেন আপনার কৃপা হবে না? আমি এমন কি পাপ করেছি!"

"গান শোন। গান শুনলে মনে শান্তি পাবে।"

গান ধরলেন রামকৃষ্ণ। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল মধুসূদনের। শান্তিতে চোখ বুজলেন।

মথুরবাবু এসে বললেন তাঁর স্ত্রী জগদম্বার খুব অসুখ। বাঁচে কি না সন্দেহ। ডাক্তার কবরেজরা জবাব দিয়ে গিয়েছেন।

পাগলের মত হয়ে গেছেন মথুরামোহন। রামকৃষ্ণ তাঁকে পাশে বসালেন। "কি হয়েছে! এত উতলা হবার কি আছে?"

রামকৃষ্ণের পায়ের উপর পড়লেন মথুরামোহন। বললেন, "আমার সংসারই মাটি হয়ে যাবে তাহলে। আপনার সেবা আর করতে পারব না, ঠাকুর।"

রামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "যাও, বাড়ি যাও, তোমার স্ত্রী ভাল হয়ে যাবে।"

বাড়ি ফিরে অবাক্ মথুরামোহন। সত্যি ভাল হয়ে উঠেছে জগদম্বা।

কী আশ্চর্য! রামকৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জগদম্বার রোগ কি টেনে নিয়েছেন নিজের শরীরে!

গঙ্গার লোনা জল মোটেই সইছে না পেটে!

দেশ থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। জল হাওয়ার বদল হবে।

"মাগো, চলো না কামারপুকুরে। কিছুদিন ঘুরে আসি।"

"না বাবা, যে কদিন বাঁচবো এখানেই এই গঙ্গাতীরে কাটাবো।"

"বেশ তুমি থাকো। আমি ঘুরে আসি।"

"ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে যা বাবা। হৃদয়কেও।"

ভৈরবীকে বলতেই তিনি রাজী হলেন। চললেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে। হৃদয়ও চলল।

মথুরবাবু চন্দ্রমণির যাতে অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কামারপুকুরে পৌঁছতেই হইচই পড়ে গেল সেখানে। রামকৃষ্ণ এসেছে! রামকৃষ্ণ এসেছে! সঙ্গে এসেছে এক ব্রাহ্মণী! হাতে মস্ত ত্রিশূল।

জয়রামবাটীতে সারদামণিকে খবর পাঠালেন রামকৃষ্ণ। ভৈরবী এসেছেন। তুমি না এলে ওঁর সেবা-যত্ন করবে কে? মা আসেননি।

সারদা খবর পেয়েই চলে এলেন। এখন একটু বড় হয়েছেন তিনি। চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়েছেন।

তবু এখনো গিন্নীপনায় কাঁচা। সঙ্গে আছে লক্ষ্মীর মা। সেই রান্নাবাড়া করে। সারদা যোগান দেন।

সারদার লজ্জাভাব কাটেনি এখনো। রামকৃষ্ণের কাছে বেশী আসেন না। ভৈরবীও আগলে রাখেন রামকৃষ্ণকে। স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। ওতে ব্রহ্মচর্যের হানি হবে।

চিনিবাস শাঁখারী তখনও বেঁচে আছে। বুড়ো হয়ে গেছে খুব। সে এল একদিন রামকৃষ্ণের প্রসাদ নিতে। প্রসাদ পাবার পর এঁটো পরিষ্কার করতে যাচ্ছে, ভৈরবী বললেন, "থাক, এঁটো আমি তুলবো।"

চিনিবাস দিতে রাজী নয়। কিন্তু ভৈরবীর গোঁ তিনি তুলবেনই এঁটো। হৃদয় এল তেড়ে! এ কী অনাচার!

গাঁয়ের বামুন মেয়ে যারা ছিল তারাও বলল "এখানে এ সব অনাচার অনাসৃষ্টি চলবে না।"

তবু ভৈরবী তুলতে গেলেন এঁটো! হৃদয় রাগ করে কি একটা ছুঁড়ে মারল। কপালের কাছে লেগে রক্ত পড়তে লাগল ঝরঝর করে।

রামকৃষ্ণ বললেন, "ওরে হৃদয়, তুই এ কি করলি। ও যে ভক্তিমতী যশোদা! ওকে ব্যথা দিলি? কেলেঙ্কারী হবে যে।"

ভৈরবী কাউকে কিছু বললেন না। কাঁদলেন শুধু। তারপর একদিন কোথায় চলে গেলেন কেউ জানে না।

কামারপুকুরে থেকে শরীর ভাল হয়ে গেল রামকৃষ্ণের। এবার ফিরতে হবে দক্ষিণেশ্বরে।

"চল্ হৃদে, যাই। অনেকদিন তো হল।"

"চল।"

বর্ধমানের কাছাকাছি এসে এক মাঠের মধ্যে বসে পড়লেন রামকৃষ্ণ।

"এ কি মামা, এখানে বসলে কেন?"

"দেখছিস না কেমন মাঠময় ধুতরাফুল আছে। এ ফুল মহাদেবের ভারী প্রিয়। ধুতরাফুলে পুজো করলে শূলপাণি প্রসন্ন হন।"

কিন্তু মাঠময় যে বিষ্ঠা! ঘিনঘিনিয়ে উঠল হৃদয়।

তাতে কি হয়েছে! বিষ্ঠা চন্দনে ভেদ নেই রামকৃষ্ণের।

"মামা, কলকাতায় যাবার একটি মাত্র ট্রেন আছে দুপুরে। সারা রাতে আর ট্রেন নেই। ট্রেন ফেল করলে যে মহা ফ্যাসাদ হবে, মামা।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা? সেখানে বসেই পুজো করতে লাগলেন শিবের। পুজো করতে করতেই ধ্যানস্থ।

পুজো শেষ হলে, স্টেশনে গিয়ে দেখলেন ট্রেন চলে গেছে। এখন উপায়!

"আগে বলেছিলাম না মামা? এখন কি করবে?" উতলা হল হৃদয়।

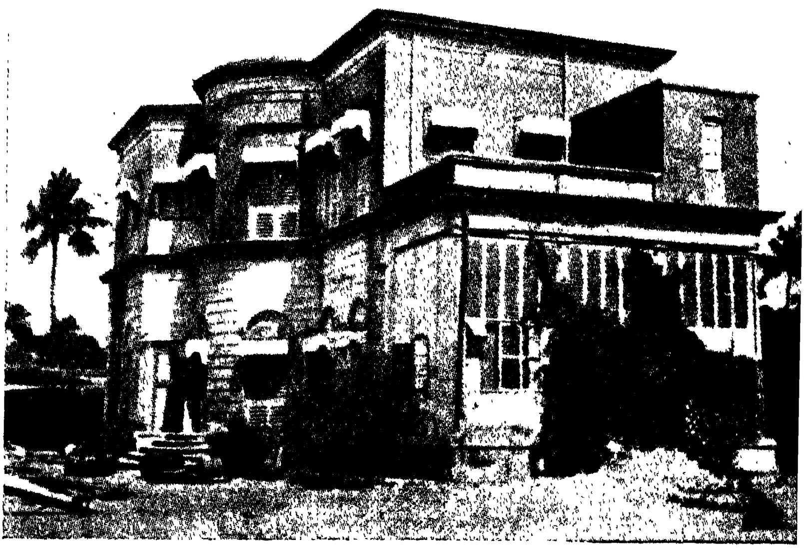
কিন্তু রামকৃষ্ণ নির্বিকার। স্টেশনের অফিসঘরে খোঁজ নিতে লাগলেন।

স্টেশনমাস্টার বললেন, "ট্রেন আজ আর নেই। তবে একটা উপায় হতে পারে। কাশী থেকে একটা স্পেশাল গাড়ি আসছে। বড় এক রেলকর্মচারীর স্পেশাল গাড়ি। সেটাতে অন্য যাত্রী তোলবার নিয়ম নেই। তবু দেখি যদি আপনাদের কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

রামকৃষ্ণকে দেখার পরই স্টেশনমাস্টারের মনে যেন কা ভাব হল। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন।



ঠাকুরের ঘর—দক্ষিণেশ্বর



কাশীপুরের উদ্যানবাটী

এখানেই ঠাকুরের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে রামকৃষ্ণ শুনলেন মথুরামোহন আর তাঁর স্ত্রী তীর্থে যাবেন। রামকৃষ্ণকেও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যেতে চান।

"মন্দ কি! সবই তো ঈশ্বরের জায়গা। তবে হৃদয়কে যেতে হবে আমার সঙ্গে।"

"ক্ষতি কি, যাক না! এত লোক যাচ্ছে।"

সত্যি বিরাট সমারোহ। একশোর উপর লোক চলল তীর্থ-যাত্রায়। থার্ড ক্লাস তিনখানি আর সেকেণ্ড ক্লাস একখানি গাড়ি রিজার্ভ হল।

যে কোন স্টেশনে ইচ্ছামত কাটিয়ে তাঁরা যেতে পারবেন। গাড়ির শেষ গন্তব্য স্থান কাশী।

হলধারী পূজকের কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছেন অনেকদিন আগে। অক্ষয় নিয়েছে পূজোর ভার।

নিশ্চিন্ত রামকৃষ্ণ।

বৈদ্যনাথধামে নামলেন প্রথম তীর্থযাত্রীরা।

কিন্তু রামকৃষ্ণের চোখ অনাথ দরিদ্রদের দিকে। রামকৃষ্ণ ধরলেন মথুরকে, "এদের এক মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। পেট ভরে খাইয়ে দাও একদিন।"

মথুরামোহন আপত্তি করলেন। বললেন, "তীর্থে অনেক খরচ হবে। এখন এসব করতে গেলে সামলাবো কেমন করে?"

"তবে থাক আমার তীর্থযাত্রা। এখানেই আমি বাস করবো।" রামকৃষ্ণ বসে পড়লেন মাটিতে।

মথুরবাবু মুশকিলে পড়লেন। কলকাতা থেকে কাপড় আনালেন। কিনলেন বাজার থেকে চাল ডাল তেল। পেট ভরে খাইয়ে দিলেন অনাথ গরিবদের।

সাত দিন দেরি হয়ে গেল কাশী যেতে। ট্রেন থেকে নেমে নৌকো করে কাশীতে পৌঁছলেন।

গঙ্গার তীরে কাশীর শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। শিশুর মত উল্লাস ধ্বনি করে উঠলেন।

কেদারঘাটের কাছে দু'খানা বাড়ি ভাড়া নিলেন মথুরবাবু। রোজ পানসিতে চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে কোন অসুবিধা হয় না রামকৃষ্ণের।

কাশীতে একদিন ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা হল। রামকৃষ্ণ দেখলেন যেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। সমস্ত কাশীধাম উজ্জ্বল করে আছেন।

একদিন নিজ হাতে পায়স রেঁধে খাইয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। মৌনাবলম্বী ত্রৈলঙ্গস্বামী। তাই কথা হল না। মুখের কথা না হোক ইশারা ইঙ্গিতে আলাপ চলতে লাগল।

রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, "ঈশ্বর এক না অনেক ?"

ইশারায় বললেন ত্রৈলঙ্গস্বামী, "যদি সমাধিতে দেখ তবে এক, আর যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ তবে অনেক। আমি তুমি জীব জগৎ সমস্ত।"

কাশী থেকে তীর্থযাত্রীরা এলেন প্রয়াগ।

মথুরবাবু সেখানে মাথা মুড়লেন। রামকৃষ্ণ বললেন, "আমার দরকার নেই।"

'দেহে সর্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি।' আমার দেহেই যখন সকলে বাস করছে তখন আমার আবার তীর্থান্তর কি ;

প্রয়াগ থেকে সকলে আবার কাশী ফিরলেন।

একদিন রামকৃষ্ণ হৃদয়কে নিয়ে চৌষট্টি যোগিনী পাড়া দিয়ে যাচ্ছেন, পথের মাঝে কাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

"আমাদের ভৈরবী না ?"

"হ্যাঁ, তাই তো মামা।"

"তুমি আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন চলো।"

রাজী হয়ে গেলেন ভৈরবী।

এলেন সবাই বৃন্দাবনে। এখানে এসে খুব খুশী রামকৃষ্ণ। বেশ জায়গা। কৃষ্ণের লীলা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। যমুনার তীরে ছুটে ছুটে বেড়ান রামকৃষ্ণ। যেন ছোট ছেলেটি হয়ে গেছেন। 'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই' বলে রাখালদের পিছনে পিছনে ছোটেন।

কালীয় দমনের ঘাটে এসে ভাবাবেশ হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

বৃন্দাবনের পর মথুরা। মথুরায় তখন জন্মাষ্টমীর উৎসব। সে উৎসবের মনভুলানো দৃশ্য দেখে রামকৃষ্ণের হৃদয় হয়ে উঠল চঞ্চল, কিন্তু মথুরার সব কিছুর মধ্যেই রাধিকার বিরহের স্মৃতি। তাই বেশীদিন ভাল লাগল না রামকৃষ্ণের। আবার ফিরে এলেন কাশীতে।

মথুরামোহন বললেন, "গয়ায় চলুন বাবা।"

রামকৃষ্ণ বললেন, "সর্বনাশ! গয়ায় গেলে কি এ দেহ থাকবে? জানো না আমার বাবার সেই স্বপ্নের কথা!"

গয়ায় আর যাওয়া হল না। ফিরে এলেন সবাই কলকাতায়। ভৈরবী কাশীতেই রয়ে গেলেন।

পনের

তীর্থ থেকে এসে মায়ের পায়ে প্রণাম করলেন রামকৃষ্ণ। মাকে জড়িয়ে ধরলেন। কতদিন পরে দেখা।

অক্ষয় বিষ্ণুমন্দিরে পুজো করছে। সেও তার পিতার মত ভক্তি-মান্ শুচিমান্। এই ভাইপোটিকে বড় ভালবাসেন রামকৃষ্ণ।

আদর করে অক্ষয়ের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পরই অক্ষয় পড়ল অসুখে। ডাক্তার দেখে বললেন, "জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে।"

রামকৃষ্ণ বললেন, "হৃদে, আমার কাছে কিন্তু লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না রে!"

আঁতকে উঠে হৃদয় বলল, "তুমি একি বলছ মামা?"

"আমি আর কি বলব? মা যা বলায় তাই বলি।"

অক্ষয় সত্যি মারা গেল তার কিছুদিন পরে।

রামকৃষ্ণ এলেন নবদ্বীপে। সঙ্গে মথুরামোহন। বড় গোসাঁইয়ের বাড়ি ছোট গোসাঁইয়ের বাড়ি দেখতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে। কত জায়গায় কত ঠাকুর দেবতার থান। কিন্তু কোথাও যেন ভক্তির সাড়া পেলেন না রামকৃষ্ণ। সব যেন শুকনো শুকনো।

কিন্তু নৌকোতে উঠতেই সব যেন পালটে গেল। 'ঐ যে, ঐ যে' বলে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ।

"কি দেখলে ঠাকুর?"

"দেখলাম দু'টি সুন্দর ছেলে। আহা, কী মধুর রূপ! হাত তুলে আমার দিকে হাসতে হাসতে ছুটে আসছে!"

গৌর আর নিতাই।

মথুরামোহন বুঝলেন নবদ্বীপের যে জায়গায় মহাপ্রভুর জন্ম তা গঙ্গায় ভেঙে গেছে। ঐ বালুর চড়া যেখানে সেটিই হল আসল নবদ্বীপ। তাই তো নবদ্বীপে ভাব না হয়ে এই নদীর বুকে এসে রামকৃষ্ণের ভাব হল।

বারোশো আটাত্তর সালের আষাঢ় মাসের শেষের দিকে মথুরবাবু জ্বরে পড়লেন। দেখতে দেখতে বিকারে দাঁড়িয়ে গেল।

রামকৃষ্ণ গেলেন দেখা করতে।

মথুর বললেন, "ঠাকুরবাড়ির ভার রইল তোমার উপর। তুমি কথা দাও দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কখনও যাবে না।"

রামকৃষ্ণ বললেন, "না, যাবো না। তোমার ছেলেমেয়েরা যতদিন আছে, ততদিন যাবো না দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে।"

পয়লা শ্রাবণ।

কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হল মথুরামোহনকে।

রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ। কিন্তু কী আশ্চর্য! চোখের পাতা শেষ বারের মত বোজবার আগে মথুরামোহন দেখলেন রামকৃষ্ণকে।

বিকেল পাঁচটার সময় রামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙল। হৃদয়কে ডাকতে লাগলেন, "ওরে হৃদে, ঐ ছাখ মথুর রথে উঠল। ঐ যে উড়ে চলে গেল রথ।"

সেদিন রাত্রেই খবর এল দক্ষিণেশ্বরে, বিকেল পাঁচটার সময় মথুরামোহন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ষোল

সারদামণি জয়রামবাটিতেই আছেন।

গঙ্গাস্নানের যোগ। অনেক লোক যাচ্ছে গঙ্গাস্নানে কলকাতায়। যাচ্ছে গাঁয়ের লোকেরাও।

"আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

"ওমা, স্নানে যাবি তুই!" আত্মীয়া বয়স্কা মহিলারা আঁতকে উঠলেন।

"আমি গঙ্গাস্নানে যাব না। যাব দক্ষিণেশ্বরে।"

"তুই এখন সোমত্ত হয়েছিস। আমাদের সঙ্গে যাবি কিরে! তোর বাবাকে জিগ্যেস করে আয়।"

সারদা লজ্জায় গেলেন না বাবার কাছে। কিন্তু তাঁর বাবার কানে সব কথা গেল। রামচন্দ্র বললেন, "কিরে স্বামীর কাছে যাবি? তা বেশ, ভালো কথা। আমিই নিয়ে যাব তোকে।"

জয়রামবাটি থেকে কলকাতা অনেক দূরের পথ। কোনদিন পথে বেরোননি সারদা। আজ বেরিয়েছেন প্রাণের দায়েই। রামকৃষ্ণ যেন আকর্ষণ করছেন তাঁকে।

পথের যেন শেষ নেই। অতি কষ্টে পা ফেলে চলছেন সারদা। শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে। পা টলছে।

"চলতে কষ্ট হচ্ছে রে সারু!"

"না বাবা।" মুখে হাসি এনে পা টান করে চলতে থাকেন সারদামণি।

পথে ভয়ানক জ্বর হল সারদার। রামচন্দ্র বাধ্য হয়ে একটি চটিতে আশ্রয় নিলেন।

জ্বরে বেহুঁশ সারদা। রাত্রে তাঁর পাশে এসে বসল একটি কালো মেয়ে। কে ?

সারদা শুধালেন, "তুমি কোত্থেকে এসেছ গা ?"

মেয়েটি বলল, "এসেছি দক্ষিণেশ্বর থেকে।"

"আমিও ভেবেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব। পথে জ্বর হয়ে পড়ল।"

"সেরে যাবে। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক।" গায়ে হাত বুলিয়ে দিল মেয়েটি।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই সারদা দেখলেন, মেয়েটি নেই। জ্বরও নেই তাঁর গায়ে।

দক্ষিণেশ্বরে এলেন সারদামণি। তাঁকে দেখে চন্দ্রমণির কী আনন্দ !

চন্দ্রমণি আগে কুঠিঘরের একটি কোঠায় থাকতেন। অক্ষয়ও থাকত তাঁর সঙ্গে। অক্ষয় মারা যাবার পর ছেড়ে দিলেন সেই কুঠিঘর। বললেন, "আমি আর এখানে থাকব না ! আমি নীচে ঐ নহবতের ঘরে থাকব। গঙ্গা দেখতে পাবো সেখান থেকে।"

রাত্রে সেই ঘরেই সারদা শুলেন।

কয়েকদিন পরে জয়রামবাটিতে ফিরে গেলেন রামচন্দ্র।

রামকৃষ্ণ একান্তে জিজ্ঞেস করলেন সারদাকে, "কি গো, তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ ?"

সারদা বললেন, "না, আমি তোমাকে কেন সংসার পথে টানতে যাব ? তোমায় ইষ্ট পথে সাহায্য করবার জন্যই আমি এসেছি।"

ঠাকুরের প্রেম-মাখান শিক্ষায় শ্রীমতী সারদা সুনিপুণা হয়ে উঠলেন। প্রকাশ পেতে লাগলেন জগতের মঙ্গলসাধিকা শক্তিরূপে।

প্রায় আট মাস সারদা ঠাকুরের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করলেন। কিন্তু এত কাছে থেকেও নাগাল পেতেন না স্বামীর। সাধারণ মানুষের মত দেহ-বুদ্ধির চেতনা রামকৃষ্ণের থাকত না। কোন কোনদিন সমাধি হয়ে অনেক সময় বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে পড়তেন। সারদামণি কিছু বুঝতে না পেরে কেঁদে উঠতেন ভয়ে।

'এমনি করে কতকাল কাটবে আমার?' একদিন বসে বসে নিজের মনেই ভাবছিলেন সারদা। 'ছেলেপুলে একটা হবে না। সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে?'

কিন্তু রামকৃষ্ণ যেন অন্তর্যামী। বললেন, "একটা ছেলে কি খুঁজছো গো! তোমার এত ছেলে হবে যে, তুমি মা ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।"

কিছুদিন পর আবার সব কিছু আলাদা হয়ে গেল। আলাদা ঘর আলাদা বিছানা। ঠাকুরকে খাওয়াতে এসে রোজই একবার করে শুধু তাঁর দর্শন পেতেন সারদামণি।

হৃদয়ের মনে ক্ষোভ। "মামা, তুমি মামীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও। তোমার যোগ্য করে তোল।"

রামকৃষ্ণ বলেন, "ওকে আবার শেখাবো কিরে। ও যে সরস্বতী। সবাইকে জ্ঞান দিতে এসেছে।"

জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী পূজার দিন ঠাকুর সারদাকে দেবীজ্ঞানে ষোড়শ উপচারে পূজা করলেন। নিবেদন করলেন ভোগ। নিজের হাতে তুলে দিলেন তাঁর মুখে নিবেদিত ভোগের কিছু অংশ। দেখতে দেখতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন সারদাদেবী। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঠাকুরও হলেন সমাধিস্থ।

সতের

চন্দ্রমণির বয়স হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারেন না। রামকৃষ্ণ একটি মেয়েকে রাখলেন মায়ের দেখাশোনার জন্য। কালীর মা। সে-ই দেখাশোনা করে, ঘরের কাজকর্ম করে দেয়।

একবার হৃদয় দেশে যাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করল। বাঁধল বোঁচকা-বুঁচকি। বলল, "মামা যাব?"

রামকৃষ্ণ বললেন, "না।"

রাগ করল হৃদয়। মামাটা কেমন! আচ্ছা, কাল আবার বলে দেখা যাবে।

পরদিন খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল হৃদয়ের। উঠে বিছানার উপর বসে রইল। হঠাৎ শুনল কালীর মা ডাকছে।

"কে রে! কালীর মা?"

"হ্যাঁ, শীগগির উঠুন। দেখুন মা যেন কেমন করছে।"

ছুটে গেল হৃদয়। রামকৃষ্ণও ছুটে এলেন। বুঝলেন, মায়ের শেষ অবস্থা।

হৃদয়ের দেশে যাওয়া হল না। চন্দ্রমণির পাশেই বসে রইল। ওষুধ আর গঙ্গাজল দিতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা করে।

তিন দিন কাটল এমনি অবস্থায়। হৃদয় প্রাণ ঢেলে সেবা করতে লাগল। কিন্তু শেষ সময় ঘনিয়ে এল চন্দ্রমণির। তাঁকে ফুল চন্দন দিয়ে সাজিয়ে গঙ্গার পাড়ে নিয়ে যাওয়া হল। পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।

হৃদয় নিয়ে এল শ্বেতচন্দন। রামলাল নিয়ে এল ফুল। মায়ের

মন্দিরের পূজারী এখন রামলাল। সম্পর্কে রামকৃষ্ণের ভাইপো। রামেশ্বরের ছেলে।

চন্দ্রমণিকে আড়িয়াদহের শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। রামলাল করল মুখাগ্নি, সৎকারও সে করল। রামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসী।

বড় শোক তাপ পেয়ে চন্দ্রমণি মারা গেলেন। বড় ছেলে রামকুমার মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। সেই শোক সামলে নিয়েছিলেন চন্দ্রমণি। আবার এই কিছুদিন আগে মারা গেলেন মেজো ছেলে রামেশ্বর।

রামেশ্বরের মৃত্যু-সংবাদ যেদিন কামারপুকুর থেকে আসে সেদিন রামকৃষ্ণের মনও আঘাতে ভেঙে পড়েছিল। ছুটে গিয়েছিলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। কাতর প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "মা গো, আমার বৃদ্ধা মাকে এই ভীষণ পুত্রশোক থেকে রক্ষা কর্।"

এই পুত্রশোকও সামলে উঠলেন চন্দ্রমণি শুধু গদাধরের দিকে তাকিয়ে। গদাধর যে তাঁর কুল উজ্জ্বল করা রত্ন—একাধারে রামকৃষ্ণ!

•

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তখন দেশজোড়া নাম। খ্রীষ্টান ধর্মের বন্যায় যখন দেশটা ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছিল তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের জীবন-তরণী ভাসিয়ে দিলেন। উদ্ধার করতে লাগলেন দেশবাসীকে।

মথুরামোহন বেঁচে থাকতেই একদিন ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের। দেবেন্দ্রনাথ আর মথুরামোহন একসঙ্গে পড়তেন হিন্দু কলেজে। সেই সুবাদে চেনা। ঠাকুরকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে।

"সংসারে থেকে তুমি ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমাকে দেখতে

এসেছি। তুমি একসঙ্গে দু'খানা তরোয়াল ঘোরাও, একটি কর্মের একটি জ্ঞানের। তুমি তো পাকা খেলোয়াড় হে।"

রামকৃষ্ণের কথা শুনে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ। মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে দেখছেন আত্মভোলা সাধককে। রামকৃষ্ণও দেখছেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি তো মস্ত বড় জ্ঞানী। আমাকে কিছু ভগবানের কথা শোনাও।"

বেদ থেকে কিছু কিছু শোনালেন দেবেন্দ্রনাথ। 'এই বিশ্বজগৎ প্রকাণ্ড একটা ঝাড়লণ্ঠনের মত। প্রত্যেকটি জীব ঝাড়লণ্ঠনের এক একটি বাতি। শুধু নিজেরা জ্বলছে না, সমস্ত কিছুকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।'

'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধু নিজেদের দেখাতে নয়, ঈশ্বরকে দেখাতে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বরকে বোঝেই বা কে বোঝায়ই বা কাকে?'

এই দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র সেন। একজন বড় ব্রাহ্মনেতা। যেমন চেহারা, তেমনি তাঁর প্রতিভা। ভক্ত এবং ভাবুক। ঈশ্বরপ্রেমিক।

রামকৃষ্ণের ইচ্ছা হল কেশব সেনকে একবার দেখবেন। ঈশ্বরানুরাগী লোকের খবর পেলেই তিনি দেখতে যান। কেশবচন্দ্র তখন বাস করছিলেন বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে। একদিন দুপুরের পর রামকৃষ্ণ বললেন, "আমি কেশবকে দেখতে যাব।"

একখানা গাড়ি করে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে চললেন বেলঘরিয়ার দিকে।

বাগানবাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল। হৃদয় আগে ঢুকল ভিতরে। বলল, "মামা এসেছেন। হরিকথা শুনতে তিনি ভালবাসেন। আপনার মুখে ঈশ্বরের গুণকীর্তন শুনতে চান।"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেশবচন্দ্র, "তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসুন।"

হৃদয় ধরে ধরে ঠাকুরকে নিয়ে এল ভিতরে, ভাবের ঘোরে বিভোর তখন রামকৃষ্ণ।

"বাপু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করে থাকো? সে কি রকম দর্শন তা জানতে এসেছি।"

কেশব তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন ভাবময় পরমপুরুষের দিকে! "আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আপনি বলুন।"

রামকৃষ্ণ বললেন, "আমি বলব? শোন তাহলে।"

গান তুললেন—

কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন,
মূলাধারে সহস্রারে সদাযোগী করেন মনন।
ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন—

কী অপূর্ব কণ্ঠস্বর! শুনে সবাই মুগ্ধ। চারদিকের আবহাওয়ায় যেন একটা বিশুদ্ধভাবের ছোঁয়া লাগল। কেশবচন্দ্রের মনে জেগে উঠল এক দিব্য অনুভূতি।

গান গাইতে গাইতে সমাধিস্থ হলেন রামকৃষ্ণ। দৃষ্টি স্পন্দনহীন, স্থির। মুখখানি হাস্যময়।

রামকৃষ্ণের কানে হৃদয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল—হরি ওঁ! হরি ওঁ!

কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভাঙল। ঠাকুর হেসে উঠলেন। বললেন, "ঈশ্বরের রূপ অনন্ত। তিনিই সাকার আবার তিনিই নিরাকার। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। এ ছাড়া তাঁর আরো কত রূপ আছে, কে জানে?"

"কি রকম? কি রকম!" প্রশ্ন করলেন কয়েকজন।

ঠাকুর বলতে লাগলেন, "এক গাছে একটি গিরগিটি থাকত। একজন সেটা দেখে এসে বললে, একটা সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার

দেখলাম। আর একজন বললে, ভুল দেখেছিস, লাল নয় নীল। এমন সময় আর একজন এসে বললে, তোরা তো খুব জানিস। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি আজ সকালে, বিলকুল হলদে। এমন সময় চতুর্থ এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের বিদ্রূপ করতে লাগল। বলল, স্রেফ সবুজ, একেবারে কচুপাতার রং।

"এই নিয়ে মহা বিরোধ উপস্থিত হল। তখন সবাই মিলে চলল সেই গাছের নীচে। গিয়ে দেখে একজন লোক বসে আছে সেখানে। তাকে সবাই ধরে বসল। আপনি তো এখানকার বাসিন্দা, বলুন তো জানোয়ারটার কী রং? লোকটি হেসে বলল, যে যেমন দেখ তেমনি। তোমাদের সকলের কথাই ঠিক। জানোয়ারটা কখনো লাল কখনো নীল কখনো হলদে কখনো সবুজ। ওটা বহুরূপী। আবার কখনো কখনো দেখা যাবে ওটার একদম রং নেই।"

এইভাবে ছোট ছোট কথায় বড় বড় তত্ত্বেও ব্যাখ্যা করতে লাগলেন রামকৃষ্ণ। কেশব ও তাঁর ভক্তরা সকলে আনন্দে সেই অমৃতধারা পান করতে লাগলেন।

"তোমরা নাকি শক্তি মানো না? শক্তি না জানলে ব্রহ্মকে জানবার জো নেই। শক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। যেমন আগুন আর তার দাহিকা-শক্তি। একটি ভাবলে আর একটি ভাবতে হয়। মণি আর আভা।

কেশব মুগ্ধ। কী আশ্চর্য ঈশ্বরজ্ঞানী এই সহজ সরল লোকটি। দেখলে বোঝবার উপায় নেই।

রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে কেশবকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমার তো ল্যাজ খসেছে।"

সেই অদ্ভুত কথা শুনে হেসে উঠল সবাই।

"তোমরা হাসছ কেন ? একথার নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে।" বললেন কেশবচন্দ্র।

"ছাখো, যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে। তারপর ল্যাজ খসে গেলে সে জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও থাকতে পারে। তেমনি মানুষের অবিদ্যার ল্যাজ যতদিন থাকে ততদিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। তা তোমার সেই অবিদ্যারূপ ল্যাজ খসেছে।"

এই সাক্ষাতের পর থেকে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। দক্ষিণেশ্বর তাঁকে টানতে লাগল। সময় পেলেই আসতেন ঠাকুরের কাছে। সঙ্গে আসতেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্য সান্যাল, আরও অনেক নামকরা ব্রহ্ম ভক্ত।

'ইণ্ডিয়ান মিরার' একটি বিখ্যাত কাগজ কেশবচন্দ্রের। সেই কাগজে তিনি লিখলেন রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। আশ্চর্য পুরুষ পরমহংস তাঁর আবির্ভাবে ধন্য এযুগের মানুষ।

কেশবচন্দ্রের মুখে মুখে এই পরমপুরুষের বাণী। পঞ্চমুখে প্রশংসা।

বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক। কিন্তু মতভেদ হল কেশবচন্দ্রের সঙ্গে। কেশবচন্দ্র 'নববিধান' নাম দিয়ে নতুন ব্রাহ্ম-সমাজ চালু করলেন। বিজয়কৃষ্ণের দলে গেলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু আর দুর্গামোহন দাশ। তাঁরা গঠন করলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

কেশবচন্দ্র এখন যেন অন্য মানুষ। ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তনে মেতে উঠেছেন। গলায় ঝুলিয়েছেন খোল।

এখন আর বিজয়ের সঙ্গে ঝগড়া করার কি দরকার ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন আছেন, তখন ভাবনা কি ? কেশব লিখলেন বিজয়কে, "বন্ধু, একবারটি দেখবে এস। এমনটি তুমি আর দেখনি।"

বিজয়কৃষ্ণ ছুটে এলেন। দেখলেন রামকৃষ্ণকে। দুই পা বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।

ঠাকুর বললেন, "দেখ, ভগবান শিব আর রামচন্দ্রের মধ্যে এক সময়ে দ্বন্দ্ব হয়েছিল। অথচ শিবের গুরু রাম আর রামের গুরু শিব, একথা সবাই জানে। কাজেই ঝগড়া আর লড়াই শেষ হল, মিলনও তাঁদের হল। কিন্তু শিবের চেলা ভূত প্রেত আর রামের চেলা বাঁদরদের মধ্যে মিল হল না। ভূত-বাঁদরে লড়াই সর্বক্ষণ চলতে লাগল। যা হবার হয়ে গিয়েছে। তোমাদের দুজনের মধ্যে আর ঝগড়া রেখে দরকার কি? ওসব ভূত আর বাঁদরদের মধ্যেই থাক।"

এর পর নূতন করে কেশবচন্দ্র আর বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা হল। কিন্তু নূতন আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠল বিজয়ের মধ্যে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে চৈতন্যমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীও আসতেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তিশ্রদ্ধা তাঁর। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজ ছাড়বার পর কি যেন হল শিবনাথ শাস্ত্রীর মনে।

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের মাথা খেয়েছে। আমারও খাবে নাকি? কি জাদু জানে ঐ সাদাসিধে লোকটা!

সত্যই জাদু জানেন রামকৃষ্ণ। কে না আসে তাঁর কাছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

শনি ও রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে ভিড় জমে যায়। মন্দিরে ঠাকুর দেখতে যত লোক না আসে তার চেয়ে বেশী আসে রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য। ঈশ্বরের কথায় ও কীর্তনে গমগম করে দক্ষিণেশ্বর। রামচন্দ্র ও মনোমোহনের সঙ্গে একদিন এলেন সুরেন মিত্র। এক ইংরেজ সওদাগরী অফিসে মুচ্ছুদ্দীর কাজ করেন। এলেন নিছক কৌতূহল নিয়ে, ফিরে গেলেন গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

আর একদিন। বারান্দায় পায়চারি করছেন রামকৃষ্ণ। এমন সময় সেখানে একজন পশ্চিম-দেশীয় বালক এসে উপস্থিত হল। এসেই প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে।

"কিরে, কি নাম তোর?"

"আজ্ঞে, লাটু।"

"বাড়ি কোথায়।"

"ছাপরা জেলায়।"

"এখানে কোথায় থাকিস?"

"শিমুলিয়ায় রামদত্তের বাড়িতে কাজ করি।"

"রোদে তোর মুখখানা পুড়ে গেছে দেখছি। আয় ভিতরে আয়। কিছু খেয়ে আসিস নি বুঝি?"

লাটুকে ভিতরে নিয়ে গেলেন ঠাকুর। তার জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। এমন একটি সাধারণ ভক্তের প্রত্যাশাতেই ছিলেন বুঝি ঠাকুর। তাই তাকে কাছে টেনে নিলেন। পরে ইনিই 'লাটু মহারাজ' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঠাকুর এমনি করে ডাকেন তাঁর ভক্তেদর। দূরে থেকে, কাছে থেকে। এমনি করে নরেন্দ্রকেও ডাকলেন।

আঠারো

১৮৮১ সালের শীতকাল।

রামকৃষ্ণ এসেছেন কলকাতায় সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে। সেখানে এলেন রাম দত্ত, মনোমোহন ডাক্তার আর তাঁর ভগ্নীপতি রাখাল।

ঠাকুর গান শুনতে চাইলেন! গান গাইবে কে? রাম দত্ত তখন ডেকে নিয়ে এলেন তাঁর মামাতো ভাই নরেন্দ্রনাথ দত্তকে। বি. এ. পাস করেছে নরেন। গান গায় ভালো। তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। তাঁর ভাবসমাধি হল।

নরেনের বয়স তখন উনিশ বছর। ফুটফুটে চেহারা। চোখমুখ থেকে যেন প্রতিভা ফুটে বেরুচ্ছে।

"ছেলেটি কে?"

"আমার মামাতো ভাই।"

ঠাকুর নরেনকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "ওরে তুই একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাস্!"

নরেন্দ্রনাথ গেল দক্ষিণেশ্বরে। একা নয়, সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু।

গান গাইল নরেন্দ্রনাথ। গান শেষ হলে ঠাকুর তার হাত ধরে নিয়ে গেলেন বাইরে! বললেন, "হ্যাঁ রে, তুই কেমন করে এতদিন আমাকে ভুলে ছিলি! তুই আসবি বলে আমি তোর পথের দিকে যে তাকিয়ে বসে আছি।"

তারপর হঠাৎ কি ভাব হয়ে গেল রামকৃষ্ণের। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমি জানি তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি। জীবের কল্যাণের জন্য তুমি দেহধারণ করেছ।"

শুনে নরেন অবাক্। কি সব কথা বলছে লোকটি। পাগল নাকি!

চিন্তাকুল নরেন বাড়ি ফিরল সেদিন। কিন্তু কি চিন্তায় তাকে পেয়ে বসল কে জানে? সেই থেকে তার ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু হল।

কিছুদিন পর।

একদিন কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গেছেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করে চলে গেলেন তাঁরা। নরেন্দ্রনাথ এক কোণে চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন আপন মনে, "ভেবে দেখলাম, যে শক্তির জোরে কেশব খ্যাতিলাভ করেছে নরেনের মধ্যে অমন আঠারোটি শক্তি আছে। কেশব আর বিজয় যদি জ্ঞানের প্রদীপ হয় তবে নরেন সূর্য।"

নরেন্দ্রনাথ উঠল প্রতিবাদ করে, "বলেন কি আপনি? কোথায় বিশ্ববিখ্যাত কেশব সেন আর কোথায় একটা কলেজে পড়া ছেলে নরেন!"

হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, "করব কি বল্। মা আমাকে যা বলে দিলেন তাই বলছি।"

নরেন্দ্রনাথ বললেন, "ওটা আপনার খেয়াল।"

রামকৃষ্ণ চুপ করে রইলেন। হাসতে লাগলেন নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

একদিন নরেন চুপচাপ বসে আছে ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর হঠাৎ তাঁর ডান পা তুলে দিলেন নরেনের কাঁধের উপর।

নরেন দেখল জগৎ সংসার দুলছে। সব যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

চিৎকার করে উঠল নরেন্দ্রনাথ, "ওগো, তুমি একি করছ আমায়! আমার যে বাবা মা রয়েছেন।"

নরেনের বুকে হাত দিয়ে ঠাকুর তার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলেন। নরেন ভাবল, ঠাকুর জাদু জানে। সম্মোহিত করেছে আমাকে। আর কখনো এদিকে ঘেঁষব না।

কিন্তু আবার এল নরেন্দ্রনাথ। কি মায়ায় ঠাকুর তাকে বশ করেছেন কে জানে!

এর কিছুদিন পরেই নরেনের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত মারা গেলেন। পিতৃশোকে ভেঙে পড়ল নরেন। তার উপর অর্থাভাব। বাবা মাসে রোজগার করতেন হাজার টাকা। কিন্তু এক পয়সাও সঞ্চয় করে যাননি।

নরেন্দ্রনাথ বের হল চাকরির সন্ধানে। কিন্তু চার মাস চেষ্টা করেও কোন চাকরি জুটল না।

একদিন এল দক্ষিণেশ্বরে। মুখ শুকনো।

"কিরে আজকাল যে বড় আসিস না এদিকে।"

"এসে কি করব!"

"কেন?"

"আমার মা বোনের যাতে দুটি খাবার যোগাড় হয় তার ব্যবস্থা করতে পারবে তোমার মা?"

"মায়ের কাছে চেয়ে দেখ্।"

"তুমি চাও না আমার হয়ে।"

"ওরে, আমি মায়ের কাছে কোনদিন কিছু চাইনি। তুই বরং নিজে যা। আজ রাতে মাকে প্রণাম করে যা চাইবি মা তাই দেবেন।"

সন্ধ্যা-আরতির পর নরেন্দ্রনাথ গিয়ে দাঁড়াল প্রতিমার সামনে। ধীরে ধীরে প্রণাম করে বলল, "মা, বিবেক দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।"

বাইরে আসতেই ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে, কি চাইলি? মায়ের কাছে টাকা পয়সা চাইলি না?"

"না, চাইলাম না তো। পারলাম না চাইতে।"

"তবে যা, আবার যা।"

নরেন্দ্রনাথ আবার ঢুকল মন্দিরে। বলল, "আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও মা, জ্ঞান দাও।"

বেরিয়ে আসতেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর, "কিরে, চাইলি?"

"না, চাইতে পারলাম না।"

"তুই যখন চাইতে পারলি না, তখন তোর অদৃষ্টে সংসার-সুখ নেই। তবে তোদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না কোন-দিন। মা আমাকে বলে দিয়েছে।"

ঠাকুরের আশ্বাস পেয়ে নরেন বাড়ি ফিরল।

সত্যিই দুর্যোগ কেটে গেল। কিছুদিন পরে মেট্রোপলিটন স্কুলে মাস্টারি জুটে গেল নরেনের।

দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হল না। সময় পেলেই নরেন আসে। ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে।

উনিশ

বরানগর সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। শ্যামবাজার মেট্রোপলিটান ইস্কুলের হেডমাস্টার।

বেড়াতে বেড়াতে সিদ্ধেশ্বর মজুমদার বললেন, "গঙ্গার ধারে চমৎকার একটি বাগান আছে, যাবে বেড়াতে ?"

"কার বাগান ?"

"রাসমণির বাগান। সেখানে একজন পরমহংস আছেন। দেখবে তাঁকে ?"

"সে তো শুনেছি উন্মাদ।"

"না হে না, চলোই না দেখে আসি।"

তু'জনে এলেন হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের ঘরে গিয়ে উঠলেন। ঠাকুরকে দেখেই যেন কেমন ভাব হয়ে গেল মনের। মহেন্দ্র গুপ্ত ভাবতে লাগলেন. একি মানুষ না মহিমামণ্ডিত জ্যোতি-পিণ্ড !

তখন সন্ধ্যা। ঠাকুরের অর্ধ-অচেতন অবস্থা। কিছুক্ষণ ঠাকুরের কাছে বসে চলে গেলেন তু'জনেই। আবার এলেন একদিন সকাল বেলা।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন মাস্টারকে, "বিয়ে করেছ ?"

জবাব দিলেন মহেন্দ্র মাস্টার, "হ্যাঁ, করেছি।"

ঠাকুরের মুখ যেন অপ্রসন্ন হল। বিয়ে করাটা কি অপরাধ ! ঠাকুর নিজেও তো বিয়ে করেছেন।

"ছেলেপুলে হয়েছে ?"

"আজ্ঞে হয়েছে একটি।"

"যা!" ঠাকুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বিরক্তির উক্তি। কিছুক্ষণ পর তাকালেন মাস্টারের দিকে। বললেন, "তোমার মধ্যে অনেকগুলো ভাল লক্ষণ ছিল। চোখ কপাল এসব দেখেই আমি বুঝতে পারছি।"

মাস্টার তাকিয়েই আছেন ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর বললেন, "জানো, মানুষের মন হচ্ছে সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি ছড়িয়ে পড়লে কুড়ানো ভার হয়ে ওঠে। তেমনি কামিনী কাঞ্চনে মন ছড়িয়ে পড়লে ছড়ানো মন কুড়ানো দায়।"

অনেক কথা হল ঠাকুরের সঙ্গে। মাস্টার বিদ্বান্ ও জ্ঞানী এণ্ট্রান্সে দ্বিতীয়, এফ. এ.-তে পঞ্চম, তারপর বি. এ.-তে তৃতীয় হয়ে বেরিয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। কিন্তু এই লেখাপড়া না জানা মানুষটার কাছে সব জ্ঞান সব দর্প যেন তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

এই মহেন্দ্র গুপ্তই উত্তরকালে রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে 'মাস্টারমশাই' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

"আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে? তাকে দেখতে বড় সাধ হয়।" ঠাকুর বললেন মাস্টারমশাইকে।

বিদ্যাসাগরের স্কুলেই চাকরি করেন মাস্টারমশাই। তাই কথাটা গিয়ে বললেন বিদ্যাসাগরকে, "পরমহংসদেব আপনাকে দেখতে চেয়েছেন।"

"কেমনতরো পরমহংস? গেরুয়াধারী সাধু?" জিজ্ঞেস করলেন বিদ্যাসাগর।

"না, সাধারণ জামা জুতো পরা মানুষ। এক অদ্ভুত ধরনের সাধু। রানী রাসমণির বিরাট কালীবাড়িতে আছেন, অথচ থাকেন একটি

সাধারণ ছোট ঘরে। তক্তপোশের উপর সামান্য বিছানা। ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানেন না ”

খুশী হলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, “শনিবার দিন নিয়ে এসো।”

গাড়ি করে রামকৃষ্ণ চললেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। সঙ্গে মাস্টার, ভবনাথ আর হাজরা।

বিরাট বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, পশ্চিমধারে ফটক। ফটকের সামনে গাড়ি থামল। রামকৃষ্ণ নামলেন গাড়ি থেকে। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে পালপেড়ে ধুতি, আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলা।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। বসতে বললেন। ঠাকুর বসলেন একটি হেলান দেওয়া বেঞ্চিতে। বিদ্যাসাগরকে তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। আর হাসতে লাগলেন ভাবাবেশে।

বললেন রামকৃষ্ণ, “এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এবার সাগর দেখলুম।”

বিদ্যাসাগর হেসে জবাব দিলেন, “তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।”

“না গো। নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি যে ক্ষীরসমুদ্র।”

বিদ্যাসাগর নীরব। রামকৃষ্ণ বললেন, “তুমি তো সিদ্ধ গো।”

“আমি সিদ্ধ?” অবাক্ হয়ে বিদ্যাসাগর বললেন, “আমি আবার সাধনা করলাম কবে? কি করে সিদ্ধ হলাম?”

রামকৃষ্ণ হেসে বললেন, “আলুপটল সিদ্ধ হলে কি হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় গলেছে। তোমার এত দয়া! তুমি নও তো আর কে সিদ্ধ?”

বর্ধমান থেকে আনা মিষ্টি দিয়ে ঠাকুরকে মিষ্টিমুখ করালেন বিদ্যাসাগর। মিষ্টিমুখেই ঠাকুর বিদায় নিলেন।

কলুটোলার হরিসভা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন রামকৃষ্ণ। বিরাট উৎসব মঞ্চ। আসরে বসে আছেন শহরের ধনী, সুধী ও ভক্তগণ। একধারে একটি উঁচু বেদীর উপর ফুলে ও মালায় সাজানো মহাপ্রভুর আসন।

ঠাকুর সভামণ্ডপে এসেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। টলতে টলতে গিয়ে বসে পড়লেন বেদীর উপর মহাপ্রভুর সেই আসনে। সভার লোকেরা এই কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। বৈষ্ণবদের মধ্য থেকে উঠল প্রতিবাদধ্বনি। কে এই পাগল মহাপ্রভুর আসনে এসে বসল? সরিয়ে দাও! সরিয়ে দাও ওকে।

কিন্তু লোকটা যে ভাবসমাধিতে ডুবে আছে। কেউ কেউ বলল, "হরিসংকীর্তন শুরু করুন।"

কী আশ্চর্য! কীর্তন আরম্ভ হতেই রামকৃষ্ণের চৈতন্য হল। পরক্ষণেই আসনের উপর দাঁড়িয়ে ভাবাবেগে তিনি নাচতে আরম্ভ করলেন। নৃত্যের কী সে ভঙ্গী! মনে হল স্বয়ং মহাপ্রভুই বুঝি আবির্ভূত হয়েছেন।

রাগ ও বিরক্তি চলে গেল সবার মন থেকে। অবাক্ হয়ে সবাই দেখতে লাগল সেই নৃত্য।

নৃত্য শেষে আবার ভাবসমাধি। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর এগিয়ে এলেন পণ্ডিত ও ভক্তরা। হরিসভার আচার্য শুরু করলেন ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা। বললেন, "ঈশ্বর নীরস, ভক্তের প্রেমভক্তিই তাঁকে সরস করে তোলে।"

রামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি যে অবাক্ করে দিলে গো। তা নয়। ঈশ্বর রসস্বরূপ। তুমি অনুভবই করনি ঈশ্বর কি জিনিস।"

হরিসভার আচার্য চুপ করে গেলেন। কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

দিনে দিনে ঠাকুরের যোগ বিভূতির মহিমা প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠল তীর্থক্ষেত্র।

দিব্যশক্তিই আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে লাগল ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তদের। সর্বসাধনায় সিদ্ধ রামকৃষ্ণ ভাবী ভক্তদের জন্য দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কই, আর সব ছেলেরা কোথায়? কবে তারা আসবে?

এল। সবাই এল একে একে। এল নরেন্দ্রনাথ দত্ত—হলেন বিবেকানন্দ। এল রাখাল ঘোষ—হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এমনি করে এলেন যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ এবং আরও অনেকে।

এই ভাবেই একদিন ঠাকুরের কাছে এসে হাজির হলেন গৃহীভক্ত বলরাম বসু। বাগবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে প্রকাণ্ড তাঁর বাড়ি। জমিদার মানুষ।

প্রথম দিন বিনা পরিচয়ে এসে ঠাকুরকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, "মশাই, ভগবান কি আছেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছেন।"

"তাঁর দর্শন পাওয়া যায় কি?"

"আপনার ভেবে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন। দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখা যায় না, তা বলে কি বলবে আকাশে নক্ষত্র 'নেই?"

"তবে তাঁকে এত ডাকি, দর্শন পাই না কেন?"

"নিজের ছেলেমেয়েদের উপর যেমন টান আছে, তেমনি আপন ভেবে ডাক কি?"

"আজ্ঞে না, সে রকম ভাবে ডাকিনি।"

"আপনার হতেও আপনার ভেবে তাঁকে ডেকো। দেখা না দিয়ে তিনি থাকতে পারবেন না।"

প্রথম সাক্ষাতেই পরমহংসদেবের মুখে এই সব কথা শুনে বলরাম মুগ্ধ হলেন। পরের দিন নিজে বাজারে গিয়ে বাজার করলেন এবং গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর খুব খুশী। হৃদয়কে ডেকে বললেন, "হৃদে, এর আনা প্রত্যেকটি জিনিস বড় পবিত্র। ও যে মায়ের আপন জন। আজ ঐ সব দিয়ে ভোগ রাঁধতে দে।"

বলরামকে বললেন, "তুমি যে মায়ের একজন রসদ্দার।"

সত্যই তাই। মথুরবাবু মারা যাওয়ার পর পাথুরিয়া ঘাটার শম্ভু মল্লিক আর বাগবাজারের বলরাম বসু—এই দুই ভক্তই ছিলেন ঠাকুরের রসদ্দার।

শুধু যে পুরুষ ভক্তরাই ঠাকুরের কৃপা পেয়েছিলেন তা নয়। ঠাকুর যখনই বলরাম বসুর বাড়িতে আসতেন তখন সেখানে অন্দরমহলে স্ত্রীভক্তরা আসতেন। অনেকেই ঠাকুরের কৃপা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পরম ভাগ্যবতী হলেন অঘোরমণি দেবী।

কামারহাটির এক বামুনের মেয়ে অঘোরমণি। সবাই ডাকে তাঁকে 'গোপালের মা' বলে।

তাঁর হল গোপালভাব। গোপাল তাঁর কাছে হাত পেতে খেতে চায়।

একদিন ঠাকুর আছেন বলরামের বাড়িতে। গোপালের মার কথা উঠল। ঠাকুর বললেন, "ওর খুব ভক্তি বিশ্বাস। ওকে আনতে পাঠাও না একবার।"

গাড়ি গেল কামারহাটি গোপালের মাকে আনবার জন্য।

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর সবাই বিশ্রাম করছে। একটু বিশ্রাম করেই ঠাকুর হলঘরে বসে ভক্তদের সঙ্গে নানা কথাবার্তা

বলতে লাগলেন। সন্ধ্যা হতে না হতেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হল। সবাই অবাক্ হয়ে দেখল ঠাকুরের বালগোপাল মূর্তি! দুই হাঁটু ও এক হাত মাটিতে হামা দেওয়ার ভাবে রেখে ঠিক গোপালের মতই ভঙ্গীতে রয়েছেন।

ঠিক তখনই গোপালের মা গাড়িতে করে এসে উপস্থিত হলেন বলরামবাবুর বাড়িতে। ঘরে এসেই দেখলেন ঠাকুরের মধ্যে নিজের ইষ্টরূপ। কারুর বুঝতে আর বাকী রইল না যে গোপালের মায়ের ভক্তির জোরেই ঠাকুর গোপাল মূর্তি ধারণ করেছেন।

কুড়ি

গিরিশচন্দ্র ঘোষ খ্যাতিমান নাট্যকার। মহাকবি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা তিনি প্রথম শুনলেন কেশবচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে।

"কেশবচন্দ্র এই লোকটার এত ঢাক ঢোল পিটিয়েছেন। দেখেই আসি একবার।"

বোস পাড়া লেনে এটর্নি দীননাথ বোসের বাড়িতে পরমহংসদেব এসেছেন। বহু লোকের ভিড়। কত ভক্ত এসেছেন। এসেছেন কেশব সেনও। ঘন ঘন ভাবসমাধি হচ্ছে রামকৃষ্ণের, প্রকৃতিস্থ হয়েই আবার উপদেশ দিচ্ছেন।

গিরিশচন্দ্র ভাবলেন, এসব বুজরুকি ছাড়া আর কি!

কিন্তু সত্যই কি সব বুজরুকি! বুজরুকি জিনিসের উপর এমন মায়া কেন? এত টানে কেন মন?

একদিন বলরামের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। সেখানে গিয়ে হাজির হলেন গিরিশচন্দ্র।

ভেবেছিলেন যাবেন না। তবু তো গেলেন!

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় হচ্ছে মনোমোহন থিয়েটারে। গিরিশচন্দ্রের লেখা, তাঁরই পরিচালনা। রামকৃষ্ণ গিয়েছেন দেখতে।

চৈতন্যের অভিনয় দেখে ভাবে গদ্‌গদ রামকৃষ্ণ। সমাধিতে ডুবে যান, আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে অভিনয় দেখেন।

অভিনয় শেষে বলেন, "একবার দেখতে চাই তোমাদের চৈতন্যটিকে।"

চৈতন্য এল। বিনোদিনী। অভিনেত্রী। মেয়ে হয়েও চৈতন্য সেজে অভিনয় করে। ঠাকুরের কাছে এসে প্রণাম করল তাঁকে। ঠাকুর আশীর্বাদ করলেন, "মা, তোর চৈতন্য হোক।"

চমকে উঠল বিনোদিনী। ঠাকুরের স্পর্শে তার অশুচি মন ধন্য হল এবার। মনের চেতনা জেগে উঠল।

একদিন গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। স্ত্রী মারা গিয়েছে। পুত্র মারা গিয়েছে। কেঁদে পড়লেন ঠাকুরের কাছে, "আমি যে পাপী, ঘোর পাপী।"

ঠাকুর বললেন, "মনের যা পাপ আছে অকপটে জানাও হরিকে। পাপের ভার লাঘব হয়ে যাবে।"

গিরিশ বললেন, "আমি হরি-টরি কাউকে চিনি না। চিনি তোমাকে। তোমাকে বকলমা দিয়েছি। তুমি ভার নাও আমার।"

অধর সেনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। অধর ডেপুটি। সেখানে এসে হাজির হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর এক ডেপুটি।

ঠাকুরকে প্রণাম করতেই বললেন, "বঙ্কিম, তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!"

বঙ্কিম হেসে জবাব দিলেন, "সাহেবের চাকরি করছি। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।"

ঠাকুর বললেন, "না, তুমি কৃষ্ণপ্রেমে বঙ্কিম। তুমি কৃষ্ণের ভক্ত।"

বঙ্কিম বললেন, "না না, আমি মোটেই ভক্ত নই। আমি সংসার-বদ্ধ জীব।"

কত রকম কথাবার্তা হল ঠাকুরের সঙ্গে।

কথায় কথায় ঠাকুর বললেন, "ঈশ্বরের কার্য কে বোঝে? কেনই বা সৃষ্টি করেছেন, কেনই বা সংহার। আমি বলি আমার ও বোঝবার

দরকার নেই। বাগানে আম খেতে এসেছি আম খেয়ে যাই। কত গাছ কত ডাল কত পাতা তার হিসেবে আমার কাজ কি? আমি চাই ভক্তি, আমি চাই ভালবাসা। আমি চাই সুস্বাদুকে আস্বাদ করতে।”

দুই ডেপুটি অবাক্ হয়ে শুনছেন ঠাকুরের কথা। মাঝে মাঝে ইংরেজীতে ফিসফাস করে কি বলছেন আর হাসছেন।

“কি গো, তোমরা হাসছো কেন?”

“অমনি।”

“শোন তবে। এক পরামানিক কামাচ্ছে এক ভদ্রলোককে। কামাতে কামাতে কোথায় লাগিয়ে দিয়েছে, আর ভদ্রলোকটি অমনি বলে উঠেছে ড্যাম। ড্যামের অর্থ জানে না পরামানিক। ক্ষুর-টুর ফেলে রেখে জামার আস্তিন গুটোতে গুটোতে বলল, ড্যাম মানে কি বলো। ভদ্রলোক বললেন,—আহা তুই কামা না। ওর মানে এমন কিছু নয়। তবে লক্ষ্মীবাবা, একটু সাবধানে কামাস। পরামানিক ছাড়বার পাত্র নয়। বললে চোখ পাকিয়ে, ড্যাম মানে যদি ভাল হয় তবে আমি ড্যাম, আমার বাবা ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যাম।”

এবার আরও জোরে হেসে উঠলেন দুই ডেপুটি। অবাক্ হয়ে গেলেন। এমন সুন্দরভাবে মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন ঠাকুর!

একুশ

গঙ্গার তীরে পানিহাটি।

প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠমাসে এখানে বৈষ্ণবদের মেলা বসে। হরিনামের মেলা। আনন্দের মেলা।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই মেলার প্রবর্তন করে গিয়েছেন। ঠাকুর প্রায় প্রতিবছর আসেন সেই মেলার মহোৎসবে। ইংরেজী শিক্ষিত ভক্তরা দক্ষিণেশ্বরে আসার পর থেকে ঠাকুর নিয়মিত যেতে পারেন না।

বারোশো বিরানব্বই সাল।

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, "আমি যাবো এবার পানিহাটিতে।"

ভক্তরা আনন্দিত। ঠাকুর যাবেন আনন্দ উৎসবে। আরো কত আনন্দ হবে।

কিন্তু বাধা দিলেন কয়েকজন ভক্ত। "আপনি যাবেন কি করে? আপনার গলায় যে ব্যথা হয়েছে।"

এবছরের বৈশাখ মাসেই ঠাকুরের গলায় দেখা দিয়েছে ক্ষতরোগ। নরেন্দ্রনাথ নিজে করেছেন তাঁর চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা। কলকাতা থেকে এসেছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। এসেছেন রাখাল ডাক্তার। তাঁরা পরীক্ষা করেছেন। ওষুধ দিয়েছেন। নিষেধ করেছেন কিছুদিন কথা বলতে। পানিহাটিতে গেলে যদি অসুখ বেড়ে যায় তখন কি হবে?

ঠাকুর নাছোড়বান্দা। বললেন, "কিচ্ছু হবে না। এখান থেকে

সকাল সকাল ছুটি খেয়ে যাব। ছু এক ঘন্টা কাল সেখানে থেকে চলে আসব তাড়াতাড়ি।"

"যদি সেখানে গেলে ভাবসমাধি হয় আপনার !"

"তাহলে গলার ব্যথাটা বাড়তে পারে বটে, তখন একটু সামলে চললেই হবে।"

ঠাকুরের গভীর আগ্রহ দেখে ভক্তরা কেউ আর আপত্তি করলেন না। যাওয়ার আয়োজন চলতে লাগল।

পানিহাটিতে গিয়ে কী আনন্দ রামকৃষ্ণের! ভক্তদের সঙ্গে বসলেন। বলেছিলেন সামলে চলবেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বেসামাল হয়ে গেলেন। কীর্তন শুনে ভাবাবেশ হল ঠাকুরের। উঠে দাঁড়িয়ে এক পা ছু পা চলেন আবার ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। ভক্তরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, থামাতে যান ঠাকুরকে। কিন্তু থমকে যান তাঁরা। ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের দেহে কি দিব্যজ্যোতি! শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে গৌরবর্ণে পরিণত হয়েছে। ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে চারদিক করেছে আলোকমণ্ডিত।

পানিহাটি থেকে ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ।

কিন্তু গলার ব্যথা এবার আরও বেড়ে গেল।

ব্যথা যত বাড়ে ভিড়ও তত বাড়তে থাকে দক্ষিণেশ্বরে। বুঝতে পেরেছে কি ভক্তরা, ঠাকুর আর বেশীদিন থাকবেন না এই ধরাধামে! ঠাকুর নিজেও তো বলেন জগন্মাতার কাছে, "একটা তো এই ফুটো ঢাক, রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে ?"

কিন্তু উপায় কি ? যে, মহান্ বাণী প্রচার করতে তিনি এসেছেন তা প্রচার না করা পর্যন্ত তাঁকে রেহাই দেবে কে ? যে কাজ করতে এসেছেন তিনি, তাই তাঁকে করতেই হবে।

নরেন একদিন গভীর রাত্রে ঠাকুরকে বললেন, "আমি নির্বিকল্প সমাধি চাই।"

নির্বিকল্প সমাধি যোগের পরম অবস্থা! অসীম আনন্দের অনুভূতি।

ঠাকুর রেগে উঠে বললেন, "লজ্জা করে না তোর! হাজার হাজার লোককে শান্তি না দিয়ে নিজের মুক্তি চাস্?"

কিন্তু শান্তি নেই নরেন্দ্রনাথের মনে। বললেন, "বলো, আমার নির্বিকল্প সমাধি হবে কি না।"

ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা যা, তোর সমাধি হবে।"

সত্যিই তারপর একদিন ধ্যান করতে করতে নরেন্দ্রনাথ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

এদিকে ঠাকুরের গলার ক্ষতরোগ বেড়েই চলল! চিকিৎসা ও সেবাযত্নের সুবিধার জন্য শিষ্যরা তাঁকে নিয়ে এলেন শ্যামপুকুরে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে।

নিয়ে আসা হল কবিরাজ। নামী চিকিৎসক।

কিন্তু ঠাকুরের ওষুধপত্র যত্ন করে তৈরি করবে কে?

শিষ্যরা ভাবলেন মা সারদামণিকে নিয়ে আসার কথা। কিন্তু ঠাকুর যদি বারণ করেন!

কী আশ্চর্য! মা নিজেই এসে একদিন উপস্থিত হলেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে। এসে সেবার ভার নিলেন।

সেবারূপিণী মা সারদামণি।

কত লোক নিত্য আসে যায় বাড়িতে। কত ভক্ত আসে ঠাকুরকে দেখতে। সবাই নিয়ে আসে ঠাকুরের জন্য ফল ও ফুল।

চিকিৎসায় কোন ফলই হল না। প্রথম প্রথম কিছুদিন উপকার হল বটে কিন্তু পরে আবার বাড়তে লাগল রোগ।

ঠাকুর একদিন দেখলেন—তাঁর শরীরের ভেতর থেকে একটা

সূক্ষ্মদেহ বেরিয়ে এসে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ঘাড়ে ও গলায় অনেকগুলো ঘা।

ঠাকুর শিউরে উঠলেন। আকুল কণ্ঠে মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, "মা, আমার গলায় এরকম ঘা কেন দিলি ?"

সঙ্গে সঙ্গে এ কথার জবাব পেলেন ঠাকুর। মা যেন বলছেন, 'কেন গলায় ঘা হল বুঝতে পারছিস না ? কত রকমের অন্যায় কাজ করে কত পাপী তোকে ধরেছে, তোকে ছুঁয়েছে। তারা শুদ্ধ হয়েছে, পাপ থেকে পেয়েছে মুক্তি। সেই পাপ ঢুকেছে তোর অপাপবিদ্ধ শরীরে। ও শরীরে এত জ্বালা সইবে কেন ? তাই তো ঘায়ের সৃষ্টি হয়েছে।'

এতদিনে ঠাকুর বুঝলেন তাঁর ব্যাধির আসল রহস্য।

সত্যিই তো, এজন্য মায়ের ওপর তো অভিমান করা চলে না। পাপের ভোগ তো আছেই—একজনকে তার ভার ঘাড়ে নিতেই হবে।

পরের দিন ঠাকুর এ কথা বললেন তাঁর ভক্তদের। ভক্তরা ক্ষুব্ধ হলেন। ঠিক হল, বাইরের কোন দর্শনার্থী যাতে ঠাকুরকে ছুঁতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

আপত্তি করলেন গিরিশচন্দ্র। বললেন, "ওটা করা কি আর সম্ভব হবে ?"

"কেন ?"

"পাপীর পাপ মোচন করার জন্যই যে উনি পতিতপাবন হয়ে এসেছেন।"

সত্যি তাই হল।

শ্যামপুকুরের বাড়িটিও দেখতে দেখতে হয়ে উঠল দেবমন্দির। দলের পর দল লোক আসে। অমৃত পরিবেশন করেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ভক্তরা অমৃতরস পান করে মহানন্দে।

শিষ্যরা সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আগলে রাখেন ঠাকুরকে। তা হলে হবে কি? ঠাকুরের কি উপদেশ দেওয়ার বিরাম আছে?

রোগ যেমন তেমনই রয়ে গেল।

মহেন্দ্র ডাক্তার একদিন পরামর্শ দিলেন, "কোলকাতার বাইরে কোথাও খোলা জায়গায় ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

শীতের মুখে রোগ আরও বেড়ে গেল। বাড়ি খোঁজ, বাড়ি খোঁজ শীগগির! তাড়াহুড়া পড়ে গেল ভক্তদের মধ্যে।

কাশীপুরে পাওয়া গেল একটি বাড়ি। গোপাল ঘোষের বিরাট বাগানবাড়ি। ভাড়া আশি টাকা।

ভাড়ার দায়িত্ব নিলেন সুরেন মিত্তির।

অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি ঠাকুরকে সেই বাড়িতে নিয়ে আসা হল।

সুন্দর বাগানবাড়ি। বাগানে নানা রঙবেরঙের ফুল। প্রশস্ত খোলা জায়গা। আলো হাওয়া প্রচুর। ঠাকুরের সেবার জন্য সঙ্গে এলেন সারদাদেবী, গোলাপ মা, লাটু, নিরঞ্জন, কাশীপ্রসাদ আর নরেন্দ্রনাথ।

এখানে এসে রোগ যেন কিছু কিছু কমতে লাগল। ঠাকুরের মনেও আনন্দ খুব।

একদিন বললেন, "ওরে, আমি বাগানে বেড়াব।"

শিষ্যরা ধরে ধরে নিয়ে এলেন তাঁকে বাগানে। বাগানে তখন অনেক ভক্ত অপেক্ষা করছিলেন ঠাকুরকে দেখবার জন্য।

তাদের দেখে ঠাকুরের মনে ভাবের সঞ্চার হল, দয়া উথলে উঠল।

ভেঙে গেল ছোঁয়াছুঁয়ির বাঁধন। ঠাকুর জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের কাছে এগিয়ে গেলেন।

হঠাৎ গিরিশচন্দ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঠাকুর হাসতে হাসতে

বললেন, "গিরিশ, তুমি তো আমার সম্বন্ধে কত কিছু বলে বেড়াও। আমাকে তোমার কি মনে হয় ?"

নতজানু হয়ে গিরিশচন্দ্র হাতজোড় করে গদ্গদ স্বরে বললেন, "শুকদেব, ব্যাস, বাল্মীকি যাঁর মহিমা বর্ণনা করতে পারে না, আমি তাঁর সম্বন্ধে কি বলব ?"

ঠাকুর যেন আজ কল্পতরু। সকলের বুক **স্পর্শ** করে আশীর্বাদ করলেন, "চৈতন্য হোক, চৈতন্য হোক।"

ভক্তদের মনের সুপ্ত অধ্যাত্মশক্তি জাগিয়ে তুললেন।

বহু লোকের জন্মাজন্মান্তরের পাপতাপ গ্রহণ করলেন ঠাকুর।

তাতে রোগের মাত্রা ভয়ানক বেড়ে গেল। গলার ভিতরের ঘা দেখা দিল বাইরে।

কেঁদে আকুল সারদামণি। চোখের জলে বুক ভেসে যায় তাঁর। মা ভবতারিণীকে স্মরণ করে আরোগ্য প্রার্থনা করেন ঠাকুরের।

গেলেন একদিন তারকেশ্বরে। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করার জন্য তারকনাথের দরজায় হত্যা দিলেন !

লীলাময় ভগবানের ইচ্ছা নয় রোগ সারে। মা সারদামণি রোগমুক্তির সংকল্প নিয়ে একে একে দুদিন কাটিয়ে দিলেন। দেহ তাঁর ক্ষীণ হয়ে এল, কণ্ঠ শুকিয়ে এল, তবু বাবা তারকনাথের কোন আদেশ পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে শ্রীমা ফিরে এলেন।

রামকৃষ্ণের গলা থেকে একদিন বেরিয়ে এল রক্ত। রক্ত দেখে চমকে উঠলেন ঠাকুর।

একদিন ডেকে বললেন নরেন্দ্রনাথকে. "নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রইল, আর তুই রইলি। তুই ওদের সৎপথে চালাস। আমি শীগগিরই দেহরক্ষা করব।"

"কিন্তু আমি কি পারব ? কি শক্তি আছে আমার ?"

"শক্তি আছে রে। তোর শক্তি আছে। মহাশক্তি যে লুকিয়ে রয়েছে তোর মধ্যে।"

"কি করে করবো আমার সেই শক্তির বিকাশ?"

"মা আদ্যাশক্তির শরণ নে। আমার যে বড় আশা ছিল তুই দীক্ষা নিবি। দীক্ষা নিবি রে তুই?"

নরেন্দ্রনাথ রাজী হলেন।

শুধু নরেন্দ্রনাথই নয়, আরও কয়েকজন যুবক এসে দীক্ষা নিলেন ঠাকুরের কাছে।

নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

একে একে চিহ্নিত ভক্তশিষ্যেরা আসতে লাগলেন ঠাকুরের কাছে প্রাণের টানে—ভক্তির টানে।

এলেন নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ, হলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। এলেন তারকনাথ—হলেন স্বামী শিবানন্দ। বাবুরাম হলেন স্বামী প্রেমানন্দ। আর রাখালচন্দ্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে খ্যাত হয়ে রইলেন। এমনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, তুরীয়ানন্দ—আরো এলেন কত চিহ্নিত ভক্তশিষ্য। তাঁরা রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে অমর হয়ে রইলেন।

বাইশ

সেরা ভক্ত দুর্গাচরণ। দুর্গাচরণ নাগ। পূর্ববঙ্গে বাড়ি। সাধুভক্ত মানুষ। ডাক্তারিও কিছুটা জানেন।

প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে আসেন সুরেশ দত্তর সঙ্গে। শুধু নাম শুনেছেন, কোথায় দক্ষিণেশ্বর তা জানেন না।

পায়ে হেঁটে চলেছেন। চলেছেন তো চলেছেনই। শেষে একজন লোকের দেখা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারেন?"

লোকটি অবাক্। "সে কি মশাই, দক্ষিণেশ্বর যে ছাড়িয়ে এসেছেন।"

অনেক ঘুরে ঘুরে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে এলেন। কিন্তু এসে শুনলেন ঠাকুর নেই, চন্দননগরে গেছেন।

জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা, "কবে ফিরবেন ঠাকুর?"

জবাব দিল একজন, "কবে ফিরবেন ঠিক নেই, তোমরা আর একদিন এসো।"

সে কথা শুনে বসে পড়লেন দুজনে। হেঁটে ফিরে যাবেন সে ক্ষমতাও নেই।

মনে বড় দুঃখ দুর্গাচরণের। এত কষ্ট করে এসেও দেখা হল না ঠাকুরের সঙ্গে। হায় রে!

এমন সময় কী অবাক্ কাণ্ড! কে একজন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাঁদের ঘরের ভেতর থেকে। হ্যাঁ, ঐ তো ঠাকুর!

দুর্গাচরণ আর সুরেশ দত্ত ঢুকে পড়লেন ঠাকুরের ঘরে। তক্তপোশের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন ঠাকুর।

এমনি করে ঠাকুর ভক্তজনের মানস পূরণ করেন।

দুর্গাচরণ যেন কত আপন জন, কত দিনের চেনা।

একদিন ঠাকুর তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "ডাক্তার কবরেজরা সব হার মেনেছে। তুমি কিছু করতে পারবে আমার উপকার?"

দুর্গাচরণ বললেন, "পারি, আপনার কৃপায় সব পারি আমি।"

ঠাকুর কি জানি কি বুঝলেন। ওঁর ব্যাধি কি নিজের শরীরে টেনে নিতে চান দুর্গাচরণ? ঠাকুর ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাঁকে। বললেন, "বুঝি, তুমি রোগ সারাতে পারো। কিন্তু সারিয়ে দরকার নেই। সরে যাও এখান থেকে।"

একদিন দুর্গাচরণ দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন একা। দুর্নিবার আকর্ষণেই চলে এলেন। তাঁকে দেখে ঠাকুর কী খুশী! বললেন, "তুমি ডাক্তারি করো, দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে?"

দুর্গাচরণ বসে পড়লেন পায়ের কাছে। স্পর্শ করা বারণ, চোখ দিয়েই দেখতে লাগলেন। বললেন, "কই, কোথাও তো দেখছি না কিছুই।"

ঠাকুর হেসে বললেন, "ভালো করে দেখ না কি হয়েছে।"

এতক্ষণে বুঝলেন দুর্গাচরণ। পা দুখানি চেপে ধরলেন দু হাতে। মাথা লুটিয়ে দিলেন পায়ের ওপর। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করলেন কল্পতরু।

এরপর দুর্গাচরণ ওষুধের বাক্স আর চিকিৎসার বই গঙ্গায় ফেলে দিয়ে দেশে চলে গেলেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তারি ছেড়ে দিলি, করবি কি?"

তুর্গাচরণ জবাব দিলেন, "আমি কে করবার! যা হয় ভগবান করবেন।"

প্রতাপ হাজরা ভক্তি করেন ঠাকুরকে। কিন্তু হাজরা শক্ত মানুষ নন। টিকতে পারেন না ঠাকুরের পরীক্ষার কাছে।

ঠাকুর একদিন বলেছিলেন ভবতারিণীর কাছে—মা, হাজরা যদি মেকী হয় তবে ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।

কদিন পরে সত্যি সরে গেল হাজরা। হৃদয়ও তো এমনি করে চলে গেছে। প্রাণাধিক প্রিয় ছিল ভাগনে হৃদয়। তার কথা মনে হলে ঠাকুরের খুব তুঃখ হতো বইকি!

হৃদয় কিন্তু একদিন এসেছিল আবার। যতু মল্লিকের বাগানে গিয়েছিলেন ঠাকুর। হৃদয় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেও কাছে যেতে পারেনি। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঠাকুর সেকথা জেনে নিজেই দেখা করতে এলেন। ঠাকুরকে দেখেই পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ল হৃদয়। কাঁদতে লাগল শিশুর মত।

ঠাকুর বললেন, "ওঠ্, কাঁদিসনি।"

কিন্তু কে কাকে সান্ত্বনা দেবে! ঠাকুর নিজেই কাঁদতে লাগলেন।

"কি করছিস এখন?" ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন।

"দেশে চাষবাস করছি। কিন্তু তোমার সঙ্গ ছাড়া হয়ে আছি। সে তুঃখের কি আর শেষ আছে?"

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল হৃদয়। তারপর চলে গেল।

এমনি করে কতজন এল গেল। এ যেন লীলাময়ের রহস্যময় লীলা। কাকে কিজন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কে জানে! কিন্তু যাকে যেটুকু করবার জন্য পাঠিয়েছেন সেটুকু তিনি ঠিক আদায় করে নেবেন। ফাঁকি দিতে পারবে না কেউ।

তেইশ

ঠাকুরের অসুখ বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন।

তবু অমৃত বিতরণের বিরাম নেই।

কোন কোন ভক্তের ভেতর তিনি দেখতে পান তাদের মনে কেমন যেন অহং ভাব।

ঠাকুর বললেন, "অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না। ঈশ্বর ভার নেন না তার।"

"শোন তাহলে। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন। হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন, বললেন, 'ঠাকুর, কোথা যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি!' এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু তখনই আবার ফিরে এলেন। লক্ষ্মী বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?' নারায়ণ বললেন, 'ভক্তটি আমার প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে যেতে যেতে ধোপাদের শুকুতে দেওয়া কাপড় মাড়িয়ে যাচ্ছিল। তাই ধোপারা তাকে মারতে এসেছিল, সেই দেখে আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।'

লক্ষ্মী বললেন, 'তবে ফিরে এলে কেন?' নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'সে নিজেই ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। তাই আমি আর গেলাম না।'

এ যেন নাবালকের অছি। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, তাই রাজা ভার নেন।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার বললেন, "যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ। ভগবান কল্পতরু, তাঁর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়। গরিবের ছেলে লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টের জজ হয়ে মনে করে 'আমি বেশ আছি।' ভগবানও তখন বলেন, 'তুমি বেশ থাক।' তারপর যখন সে পেনশন নিয়ে ঘরে বসে তখন সে বুঝতে পারে, 'এ জীবনে করলুম কি?' ভগবানও তখন বলেন, 'তাই তো তুমি করলে কি?'

শুধু কি এই উপদেশ!

উজাড় করে দেন মনের ভাণ্ডার!

"বালকের মত বিশ্বাস চাই। বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয় সেই ব্যাকুলতা চাই। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর-দর্শন।"

জটিল বালকের কথা জান? সে পাঠশালায় যেত। একটি বনের পথ দিয়ে যেতে হত পাঠশালায়, তাই সে ভয় পেত। মা জানতে পেরে বলল, 'তোর ভয় কি? তোর মধুসূদনকে ডাকবি।" জটিল জিজ্ঞেস করল, 'মধুসূদন কে মা?' মা বলল, "মধুসূদন তোর দাদা হয়।' তখন জটিল একলা যেতে যেতে যেমনি ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, 'দাদা মধুসূদন!' কেউ কোথাও নেই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল, 'কোথায় দাদা মধুসূদন! তুমি এসো, আমার বড় ভয় করছে।' ভগবান তখন আর থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, 'এই যে আমি, তোর ভয় কি?' এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আরও বললেন, 'তুই যখনই ডাকবি, আমি আসব। ভয় কি!'

এই বালকের বিশ্বাস! এই ব্যাকুলতা! ব্যাকুলতা থাকলে সব মত সব পথ দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সময়ের কত উপদেশ ভক্তদের মনে গাঁথা হয়ে থাকে।

মণিমুক্তার চেয়েও এর দাম যে অনেক বেশী।

"কি টাকা টাকা করছ! মান মান করছ! ওসব এখন ছেড়ে দিয়ে একচিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। ঐ আনন্দ ভোগ কর। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। জগৎচৈতন্য তিনি।"

একটা গল্প শোন।

"একজন রাজা ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনত। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বলত, 'রাজা, বুঝেছ? রাজাও রোজ বলত, 'তুমি আগে বোঝ।' ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন! আমি রোজ এত করে বোঝাই আর রাজা উলটে বলে, 'তুমি আগে বোঝ!' এ কি হল! পণ্ডিতটি সাধন-ভজন করত। কিছুদিন পরে তার হুঁশ হল যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—গৃহ, পরিবার, ধন, মান-সম্ভ্রম সব অবস্তু।

তাই বলি, অনেক তপস্যার ফলে মানুষ-জন্ম হয়েছে! এই জন্মে যদি ঈশ্বরলাভ না হল, আর কোন্ জন্মে হবে। তপস্যা চাই, সাধুসঙ্গ চাই, তবে ঈশ্বরলাভ হয়। শঙ্করাচার্য বলতেন, ঈশ্বর-দর্শনের উপায় তিনটি—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষত্ব আর মহাপুরুষ সংশ্রয়।

যে ঈশ্বরলাভ করেছে সে অমৃত ফল লাভ করেছে। তার পুনর্জন্ম হয় না। তাই তো আমি সারা জীবন ধরে লোককে বলে আসছি—ওরে লাউ, কুমড়া ফল নিয়ে কি হবে, অমৃতফল লাভের চেষ্টায় লেগে যা। ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

সকল মতে, সকল পথেই কিছু না কিছু ভাল আছে। ধর্মের মানে সম্প্রদায় নয়, অনুভূতি।

আমার ধর্মই ঠিক আর সকলের মিথ্যা—এ ভাব ভাল নয়। তিনিই সব হয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম—সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন এক তিনি। এক ছাড়া দুই নেই।

এক ঈশ্বরকে লোকে নিজের নিজের ভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্নরূপে উপাসনা করে থাকে। এক রাম—তাঁর হাজার নাম। বেদে যাঁকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলেছে, পুরাণে তাঁকেই সচ্চিদানন্দ শিব বলেছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত, সেই একজনেরই কথা বলেছে।

যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণই সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক। দেহেরই এইসব ; আত্মার নয়। আত্মজ্ঞান হলে সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু স্বপ্নবৎ বোধ হয়।

তপস্যা চাই, তবে বস্তুলাভ হবে। শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করলেও কিছু হবে না। 'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' মুখে বললে নেশা হয় না! সিদ্ধি খেতে হয়। তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তাহলে সব তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না। জানো তো সেই গানটা—

গয়াগঙ্গা, প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালী নামে কতগুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। তিনি মানুষ হয়ে যুগে যুগে আসেন।

অসুখ একটু সারবার উপক্রম হয়েছিল, তারপর থেকে উপশমের আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে অসুখ চলতে লাগল আপন গতিতে।

মুখে জমতে লাগল লালা।

চিকিৎসার ধারা না বদলালে আর চলে না।

এলেন রাজেন কবিরাজ। তিনি ওষুধ দিলেন। পথ্য দিলেন গুগলির ঝোল।

গুগলি যোগাবে কে? কালীপ্রসাদ কাশীপুর বাগানের পুকুর থেকে গুগলি তুলে খোসা ভেঙে দেন আর সারদা দেবী তাই দিয়ে ঝোল রেঁধে আহার করতে দেন পরমহংসকে।

শীত কেটে গেল।

এল গ্রীষ্ম।

ঠাকুরের কাল রোগ কি আর সারবে না? ভক্তদেব মনে ব্যাকুল প্রার্থনা—ব্যাকুল প্রশ্ন।

বর্ষাও যায় যায়।

শ্রাবণ মাসে ঠাকুরের রোগ খুব বেড়ে গেল। গলা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল রোজ।

দেহ নির্জীব। ওঠবার সামর্থ্য নেই।

সেদিন সকালে অবিরাম রক্ত পড়ছে। বিবেকানন্দ ঠাকুরের মুখের সামনে পাত্র ধরে রয়েছেন। এমন সময় ঠাকুর হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণ-কণ্ঠে বললেন, "জীব, আমি যে তোর জন্য পাত্র পাত্র রক্ত ঢাললাম, তুই আমার কি করলি?"

বিবেকানন্দের মনের মধ্যে জেগে উঠল এক প্রবল সংশয়। মন বলে উঠল, 'একবার নিজের মুখে বলে যাও যে তুমি অবতার, তাহলে মানব, নইলে মানব না।'

অন্তর্যামী রামকৃষ্ণ। রক্তবমি করতে করতে মুমূর্ষু পাণ্ডুর মুখখানি তুলে বিবেকানন্দকে বলে উঠলেন, "এখনো তোর সন্দেহ? যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং এই দেহে সেই-ই রামকৃষ্ণ।"

সকল সংশয়ের অবসান হল বিবেকানন্দের।

শ্রাবণ মাস শেষ হতে চলল।

"ওরে, পাঁজিখানা পড়তো শুনি।"

যোগীন্দ্রনাথ পাঁজি পড়তে লাগলেন। সেদিন থেকে শুরু করে পড়া হল পর পর কয়েকটা দিনের বিবরণ। একত্রিশে শ্রাবণের সংক্রান্তির দিনটিও পড়া হল। ঠাকুর পাশ ফিরে শুলেন। বললেন, "এখন থাক্।"

একদিন নিভৃতে বিবেকানন্দকে ডেকে ঠাকুর বললেন, "আয়, কাছে একটু বোস্।"

মানসপুত্রের হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতে অনেক কাজ করবি।"

এল শ্রাবণ সংক্রান্তি।

রবিবার।

ভক্তগণের সমাগমে সারা বাগান আজ ভরে গিয়েছে! তাঁদের মৃদু কোলাহলে সারা বাগান মুখরিত।

ঠাকুর আজ বড় চঞ্চল। শরীরে অসহ্য জ্বালা। এত জ্বালা আগে কখনো বুঝি হয়নি।

ডাক্তার নবীন পালকে ডেকে আনা হল। ঠাকুর ডাক্তারকে দেখে বললেন, "আজ আমার গা ভারী জ্বলছে। কে যেন শিরায় শিরায় ফুটন্ত গরম জলের পিচকারি দিচ্ছে। কেন বল তো?"

নবীন ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেলেন মাথা নীচু করে, ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে।

সেদিন কিছুই খেলেন না ঠাকুর। ভক্তরা কত পীড়াপীড়ি করলেন। সারদামণিও বললেন কত।

"না, কিছু খাবো না আমি। আহারে রুচি নেই।"

গায়ের জ্বালা বুঝি কমল একটু। শুয়ে রইলেন নির্জীবের মত। ভক্তরা বাতাস করতে লাগলেন।

একটু তন্দ্রার মত হল। রাত তখন দেড়টা।

হঠাৎ জেগে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, "আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। শীগগির খেতে দাও।"

ছোট শিশু যেন বায়না ধরেছে খাবারের। সুজি তৈরী করাই ছিল। ভক্তরা সুজির পাত্র ধরলেন ঠাকুরের মুখের কাছে। বিছানায় বসে পেটপুরে সবটুকু সুজি খেয়ে নিলেন ঠাকুর।

"বেশ আরাম লাগছে এবার। একটু ঘুমোই।"

শান্তিতে চোখ বুজলেন ঠাকুর। একটু পরেই চোখ মেলে বললেন, "ছাখ, আমার হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে।"

হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি একা খাবেন ঠাকুর! এটা কেমন কথা? কি রহস্য আছে এর ভেতর?

ভক্তরা কেউ বুঝলেন, কেউ বুঝলেন না। ঠাকুর নিজের মুখে তাঁরই মহোৎসবের নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

ঘর নিস্তব্ধ।

ঠাকুর শুয়ে আছেন চুপ করে। সেবারত ভক্তদের কারুর মুখে কোন শব্দ নেই। সবার দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর স্তিমিত নয়নে যেন ধ্যান করছেন মহাকালীর।

কোথায় দক্ষিণেশ্বর আর কোথায় কাশীপুর। কাশীপুর আজ মহাতীর্থ। জাগ্রতা দেবী ভবতারিণী যেন দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে এসেছেন তাঁর প্রিয়তম সন্তানের পাশে। রামকৃষ্ণ তাই ডুবে আছেন মায়ের ধ্যানে।

সহসা নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল।

কালী! কালী! কালী!

ভক্তরা চমকে উঠলেন। ঠাকুরের কণ্ঠ থেকে একি আশ্চর্য ধ্বনি! রোগ-কাতর কণ্ঠের ধ্বনি নয়। উদাত্ত কণ্ঠস্বর। এমন স্বর ভক্তরা ঠাকুরের কণ্ঠে অনেকদিন শোনেননি।

কালী !   কালী !   কালী !

বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে সকলে তাকালেন ঠাকুরের দিকে। কি এক দিব্য জ্যোতিতে ভরে উঠেছে ঠাকুরের মুখমণ্ডল ! অর্ধ-নিমীলিত চোখ দুটি থেকে ঝরছে প্রেমের অমিয়ধারা !

কালী !   কালী !   কালী !

এই শেষ বাণী। মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন যুগাবতার রামকৃষ্ণ।

বারোশো তিরানব্বই সাল, একত্রিশে শ্রাবণ। রাত তখন একটা।

সেদিন ছিল কৃষ্ণা প্রতিপদ।

চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে সারা পৃথিবী আলোকিত। কিন্তু নীরব নিঃসঙ্গ বেদনায় স্তব্ধ।

ধীরে ধীরে রাত্রির শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল।

ঠাকুরের সমাধি আর ভাঙল না।

ভোর হল।

পরদিন পয়লা ভাদ্র, সেই সমাধিই হল মহাসমাধি।

সারদা দেবী ক্লান্তিতে ও পরিশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাঁর ঘরে। তাঁকে ডেকে আনা হল। ঘরে ঢুকেই স্বামীর নিস্পন্দ দেহের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন।

"মা, তুই কোথায় গেলি গো !"

শুধু এই ক'টি কথা বলেই সাধ্বী নীরব হলেন। বসলেন স্বামীর পদতলে। বসেই তিনি সমাধিতে ডুবে গেলেন। বিন্দুমাত্র শোকের চিহ্ন তখন আর তাঁর মুখে নেই।

শতাব্দীর পটে এক অপার্থিব লীলার অবসান হল। যুগাবতার রামকৃষ্ণ একটি যুগের চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলেন মহাকালের বুকে।

সমাপ্ত